ষষ্ঠ অধ্যায়

বালুরঘাটের বিশিষ্ট কয়েকজন অভিনেতা/অভিনেত্রী, পরিচালক ও নেপথ্য কর্মীর সাধারণ পরিচয়

একজন নাটককার নাটক লেখেন। ঘটনা অথবা কল্পনা সম্ভূত সেই রচনা শুধু মাত্র পাঠের উপযোগী কিন্তু নাটকতো দৃশ্য-শ্রাব্য। নাটকের প্রাণ প্রতিষ্টা করে মঞ্চে মূলত অভিনেতা অভিনেত্রীরা কিন্তু অভিনয়কে শিল্প মর্যাদায় উন্নত করতে গেলে মঞ্চের পেছনে যাঁরা কাজ করেন তাঁরাও সমান ভাবে নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠার অংশীদার। আলো, সংগীত, মঞ্চ এবং পাত্র-পাত্রী নৃপুন মাপের দক্ষতায় সেই নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে অভিনেতা ও অভিনেত্রী ছাড়াও চরিত্র পরিস্ফুটনে সাহায্য করেন মেক-আপম্যান, আবহসঙ্গীতকার, উপকরণ সরবরাহকারী, পোষাক পরিকল্পনাকার, আলোকপ্রক্ষেপণে যারা সাহায্য করেন, সঙ্গীত (আধুনিক প্রযুক্তিতে) যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন তারা প্রত্যেকেই একটি নাটক রচনাকে সার্থক করে তোলেন। বালুরঘাটের সকল নাট্যকর্মীর ব্যাক্তি পরিচয় দেওয়া সম্ভব হল না, কিছু বিশিষ্ট নাট্যকর্মীর ব্যক্তিপরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হল :-

উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৪-১৯৫৬)ঃ-
উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বালুরঘাট নাট্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সদস্য। বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার শ্রীনগর থানার নাগরভাগ গ্রামের 'দারোগা বাড়ী'তে ১৮৭৪ সালে উমেশ চন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা দক্ষিণা দেবী। তাঁর পিতা চন্দ্র কান্ত বন্দ্যোপাধায় দরিদ্র ছিলেন তাই তিনি তাঁর মামা বাড়ি থেকে পড়াশোনা করতেন। নবম ও দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি জমিদার বাড়িতে পুজোর কাজ করে পড়াশোনা করতেন। ১৯৮৫ সালে মালখানগর হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রাস পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৮৯৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার একটি ইংরাজী স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ১৯০১ সালে মোক্তারী পরীক্ষায় পাশ করেন। প্রথমে ময়মনসিংহের কোর্টে প্র্যাকটিস করেন। ১৯০৪ সালে বালুরঘাট থানা ও মহকুমা ঘোষিত হলে তিনি বালুরঘাটে এসে মোক্তারী শুরু করেন। ১৯০৪ সাল থেকেই বালুরঘাটের জয়যাত্রা শুরু হল। উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসাহী, পরোপকারী, আনন্দপ্রিয় ব্যাক্তি ছিলেন। ১৯০৪ সাল থেকে বালুরঘাটে বহু উচ্চ সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ আসতে শুরু করেন। কিছু নাট্যমোদী নাটক অভিনয়ের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উমেশ চন্দ্র বন্ধ্যোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম। শোনা যায় তিনি সুঅভিনেতা ছিলেন কিন্তু কোন্ কোন্ নাটকে অভিনয় করেছেন তা জানা যায় না। তাঁর উত্তরসূরিরা দক্ষ অভিনেতা ছিলেন।

১৩৬৩ সালের ১০ই শ্রাবণ তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

নলিনীকান্ত অধিকারী (১৮৭৫-১৯৬১)ঃ নলিনীকান্ত অধিকারী 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির' এর (১৯০৯) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বালুরঘাট নাট্যমন্দির এর প্রথম কার্যকরী সভার

সভাপতি। মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী থানার বাসুদেবপুর গ্রাম নিবাসী এবং দিনাজপুরের রাণী মিনা কুমারী এষ্টেটের ম্যানেজার নবদ্বীপ চন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের পুত্র নলিনীকান্ত অধিকারী। ১৮৭৫ সালে বাসুদেবপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। বাসুদেবপুরেই প্রাথমিক পড়াশোনা, ১৮৯১ খ্রী: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ইউনিভারসিটি বৃত্তি লাভ করেন। বহরমপুর কলেজ থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা প্রেসিডন্সী কলেজ থেকে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন। ১৮৯৯ সালে রিপন কলেজ থেকে বি. এল. পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৫ সালে বালুরঘাটে একটি মুন্সেফী আদালত স্থাপিত হয়। মুর্শিদাবাদের জমিদার রায় ধনপৎ সিং মহাশয়ের 'কুঠিকাছারী' ছিল বালুরঘাটে। জমিদার নিজস্ব স্বার্থরক্ষার্থে তিনি নলিনীকান্ত অধিকারীকে বালুরঘাটে আনেন। এরপর নলিনীকান্ত বাবু বালুরঘাট আদালতে আইন ব্যবসা শুরু করেন। বালুরঘাটে এসে তাঁর আইনী ব্যবসাও যেমন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তেমনি নানা জনহিতকর কাজ করতে লাগলেন। তিনি সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তি ছিলেন তাই কয়েকজন নাট্যোমোদী ব্যক্তি মিলে গড়ে তোলেন 'বালুরঘাট থ্রিয়েটিক্যাল অ্যাশোসিয়েশন ক্লাব' তিনি অভিনয় করতেন শোনা যায় কিন্তু কোন নাটকের নাম সংগ্রহ করা যায়নি। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীও ছিলেন, বালুরঘাটে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণও করেছেন। বালুরঘাট শহর স্থাপন থেকে শুরু করে শিক্ষা, সংস্কৃতি, মুক্তি আন্দোলনে সব কিছুতেই যুক্ত থেকে ১৯৬১ সালের ১১ই আগষ্ট ইহলোক ত্যাগ করেন।

শিবপ্রসাদ কর (১৮৯২-১৯৬৬)ঃ দিনাজপুর নাট্য সমাজের প্রাণপুরুষ ছিলেন শিবপ্রসাদ কর। এমন দক্ষ ও সূক্ষ্ম শিল্পবোধ সম্পন্ন সচেতন মঞ্চশিল্পী সমসাময়িক গ্রাম বাংলায় খুবই কমই জন্ম গ্রহণ করতে দেখা যায়। নাট্য সাধনাই ছিল তাঁর জীবন সাধনা। মঞ্চের দক্ষ সংগঠক ও শিল্পী হিসেবে তিনি দিনাজপুরের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অদ্বিতীয় ব্যক্তি। কলকাতার নাট্য চর্চার প্রভাবালয় থেকে বহুদুরে নির্জন নিভৃত জনপদে নাট্যসাধনায় আজীবন তিল তিল করে যারা বিলিয়ে দিয়ে গেছেন এমন মঞ্চসাধক গুনীজনদের অন্যতম শিল্পী ও প্রযোজক ছিলেন দিনাজপুরের রঙ্গমঞ্চের প্রবাদ পুরুষ শিবপ্রসাদ কর। দিনাজপুরের নাট্যাভিনয়ের জনক হরিচরণ সেনের মৃত্যুর পর (১৯৩০) পরবর্তী পর্যায়ে দিনাজপুরের রঙ্গমঞ্চের কর্ণধারের আসন লাভ করেছিলেন তিনি।

১৮৯২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী দিনাজপুর শহরের গনেশতলায় এক সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে শিবপ্রসাদ করের জন্ম। পিতা কার্তিক প্রসাদ কর, মাতা প্রসন্নময়ী দেবী। মেধাবী শিবপ্রসাদ দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রাস পাশ করেন। ১৯১৪ সালে কলকাতা সি.টি. কলেজ থেকে গ্যাজুয়েট হন এবং ১৯১৭ সালে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ল'কলেজ থেকে বি.এল. পাশ করেন।

হরিচরণ সেনের তত্ত্বাবধানে ডায়মন্ড জুবিলী থিয়েটার হলে শিবপ্রসাদ করের অভিনয়ে হাতে খঁড়ি। তাঁর প্রথম অভিনয় নারী চরিত্রে। ১৯১৪ সালে দিনাজপুর জেলা স্পোটিং ক্লাবের সাহায্য কল্পে দিনাজপুর নাট্য সমিতি আয়োজিত 'চাঁদবিবি' নাটকে নাম ভূমিকায় প্রথম অভিনয়। দ্বিতীয় অভিনয় 'মোগল-পাঠান' নাটকে কমলা চরিত্রে। এর পর তিনি করেন 'দেবীচৌধুরাণী'তে সাগর বৌ, 'দেবলাদেবী'তে কমলা চরিত্রে। তিনি প্রথম দিকে সমস্ত নাটকে নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুইপুরুষ' নাটকে 'নুটুবিহারী'

চরিত্রাভিনয় তার প্রথম পুরুষ চরিত্রে অভিনয়। সময় ১৯৩৩। 'দিনাজপুর নাট্য সমিতিতে' শিবপ্রসাদ করের উদ্যোগে 'দুইপুরুষ' অভিনীত হওয়ার পূর্বে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ''দিনাজপুরে আসলেন অমর কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটক করতে নয় বরং দিনাজপুরের মঞ্চে তার নিজের লেখা নাটকের অভিনয় নিজেই দেখতে।''[১] কিন্তু 'দুই পুরুষ' নাটকের নুটুবিহারী চরিত্রে অভিনয় যেটা শিবপ্রসাদ করেছিলেন সেটা শ্রষ্টার মোটেও পছন্দ হয়নি। বিমূঢ় শিবপ্রসাদ তাঁকে অনুরোধ করেন পরের রজনীতে নাটকটির পুনরাভিনয় দেখার জন্য। ''রাতারাতি নাটকটির মহড়া দিয়ে নুটুবিহারীর নতুন চরিত্র চিত্রণ করে নিজেকে রীতিমত তৈরি করে নেন দিনাজপুরের রঙ্গমঞ্চের দক্ষ যাদুকর শিবপ্রসাদ কর''[২]। দ্বিতীয় রজনীর অভিনয় দেখে তিনি অবিভূত হন। ''তাঁর কথায়-'দিনাজপুরের নাট্য মঞ্চের কোন তুলনা নেই বাংলার ইতিহাসে। আমার লেখা নাটকের এমন অপূর্ব অনবদ্য মঞ্চায়ন শুধু দিনাজপুরের মঞ্চেই সম্ভব-অন্য কোথাও নয়। আমি যা; নই, আমার নাটকে যা নাই নাটকীয় চরিত্রের সেই অনাবিস্কৃত অসাধারণত্বের সত্ত্বা আমি যেন আজ খুঁজে পেলাম দিনাজপুরের মঞ্চে নিজের লেখা নাটক দেখতে এসে। শিল্পীর চোখে প্রকৃত নিজেকে দেখতে পেয়ে আজ ধন্য হলাম আমি।' .....''[৩]।

১৯৪৭ সালের পূর্বে তাঁর অভিনীত নাটক-'বঙ্গেবর্গি'(সিরাজ), 'দেবাসুর' (বৃত্তাসুর), 'কর্ণার্জুন'(অর্জুন), 'সীতা'(লক্ষণ), 'শ্রীকৃষ্ণ'(দুর্যোধন), 'প্রতাপাদিত্য'(শঙ্কর), 'উত্তরা' (অর্জুন), 'সাবিত্রী'(দ্যুমৎসেন), 'মা'(নিতাই), 'চিরকুমার সভা'(পূর্ণ), 'সাজাহান'(সাজাহান), 'পথের শেষে' (শ্যামা), 'মাটির ঘর' (কল্যান), 'পরদেশী' (মোবারক), 'কঙ্কাবতীর ঘাট', (মি: মুখার্জী), 'কেদার রায়' (কার্ভালো), 'তটিনীর বিচার', (ড. বোস) প্রভৃতি।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় তিনি দিনাজপুর থেকে ১৬মাইল দূরে বালুরঘাট থানার বাহিচা কাছারী বাড়িতে চলে আসেন। বালুরঘাটে এসে তিনি বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে যোগদান এবং এখানে বহু নাটক অভিনয় করেন। ১৯৫২/৫৫ সালে মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা নিয়ে সরকারী স্তরে আঞ্চলিক নাট্যপ্রতিযোগিতায় শিবপ্রসাদ কর 'কালিন্দী' নাটকে মূল চরিত্র অভিনয়ে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে 'স্বর্ণপদক' এ ভূষিত হন। শিবপ্রসাদ করের নাট্য প্রতিভা সম্পর্কে গায়ক অভিনেতা প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছেন-''প্রণাম করি শিবপ্রসাদ করকে, তিনি নাটকের না নাটক তাঁর জন্য এর উত্তর দিতে পারবো না 'কালিন্দী' নাটকে আপনারা দেখেছেন সেই অভিনয়, সেই চলা, সেই চোখ-সেই দৃষ্টি। বালুরঘাট নাট্যমন্দির মঞ্চে ভোলা অসম্ভব।''[৪] নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বলেছেন ''শিব কর ছিলেন দিনাজপুর স্টেজ এর দোর্দন্ড প্রতাপ অভিনেতা-রাজেন তরফদারের গুরু। শিব কর ছিলেন খুবই সৌখিন মানুষ-পোষাক-আসাক, আচরণে খুবই বাবু অভিনেতা যথেষ্ট নাক উচু, অহংকারী মানুষ ছিলেন। নাট্যমন্দিরে সবাই তাকে খুব সমীহ করতেন। বাহিচা থেকে রিকশো করে মহড়ায় আসতেন আবার সেই রিকশাতে বাড়ি ফিরে যেতেন। বাচিক অভিনয়ে ইর্ষনীয় ছিল তাঁর উচ্চারণ, Throuing শারীরিক অভিনয়ে যথেষ্ট সক্ষম ছিলেন। চেহারা গলা কোনটাই মঞ্চ উপযোগী ছিল না, মহিলা সুলভ তীব্র ছিল কন্ঠস্বর -কিন্তু অভিনয় কালে দর্শক এসব ভুলে যেত। এমনই ছিল তাঁর অভিনয় সম্মোহন।''[৫]

শিবপ্রসাদ করের দৌহিদ্র কালী কর জানিয়েছেন ''তাঁর (শিবপ্রসাদ) সঙ্গে দেখা করতে

একাধিকবার বাহিচায় ছুটে এসেছেন মন্মথ রায়, কুমার রায়ের মত নাট্য ব্যক্তিত্ব। তাঁরা ঘরে বসে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতেন।''[৬] শিবপ্রসাদ কর দুটি নাটকও লিখেছেন- ১। প্রতিষ্ঠা ২। স্বর্ণলংকা। শিবপ্রসাদ নেশায় ছিলেন নাট্যকর্মী, আর পেশায় ছিলেন আইনজিবী। দিনাজপুর থাকা কালীন তিনি সমাজসেবা মূলক কাজে নিয়োজিত করেছিলেন নিজেকে। খেলাধুলা করতেন, ফুটবল মাঠে রেফারীর দায়িত্ব পালন করতেন। বালুরঘাটে এসেও তিনি সমাজ সেবা মূলক কাজে নিয়োজিত করে ছিলেন নিজেকে। ১৯৬৬ সালে ২৪ মে নট-নাটককার, নির্দেশক, মানবতাবাদী শিব প্রসাদ বাহিচার বাড়িতে পরলোক গমন করেন।

কিশোরীমোহন বিশ্বাস (১৯০৩-১৯৭৬)ঃ বালুরঘাটে যত অভিনেতা আছে কিশোরী মোহন বিশ্বাস তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট অভিনেতা। যদিও তিনি যাত্রা শিল্পী। বালুরঘাটের অভিনেতাদের মধ্যে তাঁর নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কিশোরী মোহন বিশ্বাসের একটা যাত্রাদল ছিল। বিশ্বাস পাড়ায় তাঁর যাত্রার মহলা কক্ষ ছিল। শিল্পীরা তাদের কাজ কর্ম সেরে বিশ্বাস পাড়ায় তাঁর যাত্রার মহলা কক্ষে উপস্থিত হতেন। তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতেন সকলে আসছে কিনা। তিনি খুব যত্ন সহকারে শিল্পীদের অভিনয় শেখাতেন, তাঁর সহযোগী ছিলেন মন্টু অধিকারী ও নীরেন কুন্ডু। কে কোন অভিনয়টি করতে পারবে, খুঁজে খুঁজে ঠিক আনতেন তিনি তাঁর তৈরি যাত্রা নাট্য মঞ্চে। দেবল রায়, কালী মজুমদার ও নিমু রায় তাঁর দলে যোগ দেন। এঁদের সকলের উপস্থিতিতে 'নিউ বাসন্তী অপেরা' তখন জমজমাট। বিশ্বাস মশাই ছিলেন সকলের দেবতুল্য। কেউ মাথা উচু করে কথা বলতেন না। বিনম্র শ্রদ্ধায় বিশ্বাস মহাশয়কে প্রণাম করে মহড়া কক্ষে হাজির হতেন এবং সমভাবে মঞ্চেও। শ্রী কিশোরী মোহন বিশ্বাসের অক্লান্ত ভালোবাসা ও যাত্রা শিল্পের প্রতি শ্রম তাঁকে এই সম্মান দিয়েছিল। এই দল উত্তরবঙ্গের সীমা ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গেও বিস্তারিত হয়, তাঁর প্রথম তৈরী 'নিউ বাসন্তী অপেরা' শৌখিন ছিল পরে পেশাদার হয়। দল জনপ্রিয়তা অর্জন করল বৃহৎ হল কিন্তু দেখা গেল আর্থিক অনটন। কিশোরী মোহন দেনার দায়ে ভুগতে থাকেন। শেষ জীবন তাঁর আর্থিক অস্বচ্ছতার মধ্যে কাটে। ১৯৭৬ এর ৩১শে মার্চ চিরনিন্দ্রায় চলে যান।

কমলেন্দু চক্রবর্তী (১৯০৪-১৯৮৪)ঃ কমলেন্দু চক্রবর্তী একজন বিখ্যাত আইনজীবি। তিনি শুধু আইন জীবিই নন, বালুরঘাটের এমন কোনো ভালো কাজ বা প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে তিনি ছিলেন না। ১৯০৪ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর রংপুর মামার বাড়িতে জন্ম। বাবা নামকরা আইনজীবি নলিনীকান্ত চক্রবর্তী, মাতা নৃপবালা দেবী। বিখ্যাত কংগ্রেস পরিবারে জন্ম-তাই জন্মসূত্রেই তাঁর মধ্যে ছিল কংগ্রেসী মনোভাব, স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুলতা যার প্রকাশ ঘটেছিল ছাত্রাবস্থাতেই। বালুরঘাটে কংগ্রেস পাড়ায় তাঁর ঠাকুরদাদার বাড়ি 'গোপাল ভিলা' থেকে তাঁর পড়াশোনা শুরু। বালুরঘাট হাইস্কুল থেকে ১৯২০ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে প্রথম বিভাগে, ১৯২৩ সালে আই. এ. পাশ করেন স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে। প্রেসিডন্সী কলেজ থেকে সংস্কৃতে বি. এ. পাশ করেন। বি. এ. পরীক্ষায় ভালো ফল করায় 'লীলাবতীপদক' লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৭ সালে বাংলায় এম.এ. পাশ করেন এবং ১৯২৮ সালে একই সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এল. ডিগ্রী লাভ করেন। 'অসহযোগ আন্দোলন' আইন অমান্য আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন এগুলির সঙ্গে বালুরঘাটের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত আন্দোলন গুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং একাধিক বার কারারুদ্ধ হয়েছেন।

তিনি দেশপ্রেমী, তাছাড়াও তিনি ছিলেন একজন সাহিত্যিক, কবি, প্রবন্ধকার, নাট্যানুরাগী ব্যক্তি। ১৯৪৫ সালে তিনি নাট্যমন্দিরে যোগদান করেন কিন্তু তাঁর অভিনীত নাটকের নাম নির্দিষ্ট করে সংগ্রহ করা যায়নি। তবে লোক মুখে প্রচলিত তিনি ভালো অভিনেতাও ছিলেন। ১৯৮৪ সালের ১০ই এপ্রিল পরলোক গমন করেন।

নরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৯৩)ঃ-

নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধায়ের জ্যেষ্ঠ্য পুত্র নরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা শিশুবালা দেবী। ১৯০৮ সালে ৮ই নভেম্বর অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার রাজদিয়া থানার ইছাপুর গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর মা ৮মাস বয়সের সময় তাঁকে বালুরঘাটে নিয়ে আসেন। বালুরঘাট হাইস্কুল থেকে ১৯২৫ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে রংপুর (বাংলাদেশ) কারমাইকেল কলেজে আই.এস.সি. পড়তে যান কিন্তু আই.এস.সি. পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য্য হন। ১৯২৯ সালে মোক্তারী পরীক্ষায় পাশ করেন এবং বালুরঘাট কোর্টে কর্মজীবন শুরু করেন। অল্প দিনেই তিনি সুনাম অর্জন করেন। খেলাধুলাতেও তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। পিতা উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব তাঁর মধ্যে ছিল। 'তাই ১৯২৫ সালের মাঝামাঝি বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে তৎকালীন এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক ক্লাব ২/৩টি নাটকে অবতীর্ণ হন।''[৭]

তিনি নাট্যমন্দিরে বহু নাটকে বিশিষ্ট ভূমিকা এবং কখনো কখনো নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তিনি নিজে ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে 'সর্পযজ্ঞ' নামে একটি নাটক লেখেন। হাতে লেখা নাটকটি কয়েক রাত নাট্যমন্দিরে অভিনীত হয়। 'তটিনীর বিচার', 'মানময়ী গালর্সস্কুল' (প্রথমে ফিরিঙ্গী পরে মানময়ীর স্বামী), 'কেদার রায়' (কার্ভালো) 'চন্দ্রগুপ্ত'(চানক্য) প্রভৃতি নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় প্রসঙ্গে নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য '' নরেশ দা খুবই নামকরা আইনজিবী। কিন্তু অভিনেতা নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আমার Roll Model চেহারা খুবই সাধারণ বরং কুশ্রী বলা যায়। কিছু আশ্চর্য ভরাট ছিল কণ্ঠস্বর, নিখুত উচ্চারণ-সে সময় বাচিক অভিনয়ের মান্যতা ছিল সর্বজন গ্রাহ্য। নরেশদার মত এমন Versatile Actor আমি খুব কম দেখেছি। বিভিন্ন চরিত্রে তাঁর স্বচ্ছন্দ্য আয়াস অভিনয় মানুষকে মুগ্ধ করত।''[৮]

''১৯০৯ এ বালুরঘাটের এডওয়ার্ড মোমোরিয়াল হলের প্রতিষ্ঠা। পরবর্তিতে নাম পরিবর্তন হয়ে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের সূত্রপাত এবং স্মরণীয় এই নামটির প্রস্তাবকও ছিলেন নরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।''[৯] তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নাট্যমন্দিরের সদস্য ছিলেন।

মহারাজা বসু (১৯০৯-১৯৮২)ঃ মাহারাজা বসু অভিনয় করতেন না কিন্তু নাট্যামোদী ব্যক্তি ছিলেন। বালুরঘাটের সংস্কৃতির আলোচনা ক্ষেত্রে মহারাজা বসু অপরিহার্য। ১৯০৯ সালে যশোহরে জন্ম। পিতা রমেন্দ্র নাথ বসু, মাতা মানদা সুন্দরী দেবী। মহারাজা বসুর প্রকৃত নাম শ্যামাপদ বসু। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন ছোট। পরবর্তী কালে তিনি হয়েছিলেন বালুরঘাট তথা জেলার গর্ব। বালুরঘাট হাইস্কুলে পড়াশোনা করেছেন। মেধাবী ছাত্র মহারাজা নবম শ্রেণী পাঠরত অবস্থায় তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন। ১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসু বালুরঘাটে কংগ্রেস ভবন উদ্বোধন করতে আসলে তিনি নেতাজীর ভক্ত হয়ে ওঠেন। ১৯৫২-১৯৬২ সাল পর্যন্ত বিধানসভার বিধায়ক ছিলেন।

বালুরঘাট হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। শৈশব থেকেই তিনি নৃত্যশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। নানা রকম আন্দোলনের

ফাঁকে তিনি কলকাতায় গিয়ে নাচ শিখতেন। ১৯৩২ সালে দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্করের নৃত্যগোষ্ঠীতে যোগদেন। উদয় শঙ্করের সাথে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে একক ও যৌথভাবে বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সুনাম অর্জন করেন। বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের সদস্য হন ১৯৫৫ সালে। তিনি নাট্যমন্দিরের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। বালুরঘাটের যে কোন গঠন মূলক কাজ যেন তাঁর জন্য অপেক্ষা করত। তিনি নিজেকে উজার করে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। ১৯৮২ সালে তিনি ৩১ মার্চ ইহলোক ত্যাগ করেন।

নিরঞ্জন বিশ্বাস (১৯১৮-১৯৯৫)ঃ নিরঞ্জন বিশ্বাসের জন্ম ১৯১৮। পিতা ফণীভূষণ বিশ্বাস, মাতা নিকঞ্জ বালা দেবী। নদীয়া জেলার শিবপুর বিদ্যালয়ের থেকে প্রাথমিক শিক্ষা। বাংলাদেশের সুজাপুর বিদ্যালয় থেকে সেকেন্ডারী পাশ। বি.টি.সি. তে বালুরঘাটে চাকুরী করতেন। পারিবারিক ভাবে অভিনয় প্রতিভা তিনি পেয়েছেন। নাট্যমন্দির ছাড়া আর কোন সংস্থাতে নাটক করেননি। 'প্রতিধ্বনি', 'ফেরারীফৌজ', 'ঝুমুর' নাটকে তার অসাধারণ অভিনয় নাট্যমন্দির মনে রাখবে।

শান্তিগোপাল রায়, মংলাদা (১৯২০-২০০২)ঃ শান্তিগোপাল রায়, পরিচিত মংলাদা বা মংলা মাষ্টার। উত্তরবঙ্গের সঙ্গীত জগতে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত তাঁদের অনেকেই মংলা মাষ্টারের কাছে তামিল নিয়েছেন। জন্ম ১৯২০ সালের ৯ই মে। বাবা জগন্নাথ রায়, মা রাধারাণী দেবী। ভগ্নিপতি বিহারী তরফদার তাঁকে বালুরঘাটে নিয়ে আসেন। ২৫ বছর বয়সে আইনজীবি রেবতী বল্লভ ঘোষের মেয়ে কল্যানীকে বিয়ে করেন। মংলাদা ছিলেন ছোট চেহারার, ছটফটে চঞ্চল, বুদ্ধিমান অবশ্য শেষের দিকে তিনি বাতিকগ্রস্থও হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী কল্যানী তাঁর সব অনিয়ম, সয়ে গেছেন নীরবে। রাণাঘাটের নগেন্দ্র নাথ দত্তের কাছে তিনি সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিলিগুড়ির সুধীর লাল অধিকারীর কাছেও তিনি তালিম নিয়েছেন। তিনি অভিনয়ও করতেন। নাট্যমন্দিরে 'ঋনংকৃত্বা' নাটকে অভিনয় করেন। অন্যান্য নাটকের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সে সময়ে নাটকে Live Music হত। নাটকে গায়কদের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট। তিনি বিভিন্ন নাটকে কণ্ঠ দিয়েছেন। ছোট যা দ্রুত খেয়ালের জাত শিল্পী ছিলেন মংলাদা। ২০০২ সালের ২৬শে মে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিশু (১৩২৯-১৩৮৬)ঃ ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ পতিরামের বিখ্যাত জমিদার বাড়ির সন্তান। পিতা কৃষ্ণলাল ঘোষ। তিনি (বিশু) বিলেত থেকে ডাক্তারী পড়ে এসে স্বভূমিতে চিকিৎসা শুরু করেন। বালুরঘাট হাসপাতালে কর্মজীবন শুরু করেন। নামকরা ডাক্তার ছিলেন ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ। তবে পরিচিত ছিলেন বিশু ডাক্তার নামে। পেশাকে সেবামূলক কাজ হিসেবে দেখেছেন। তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ একান্ত ভাবেই আত্মমুখী, বাইরে থেকে তাকে রসহীন বলে মনে হতো, কিন্তু তিনি ছিলেন আনন্দদানকারী হাস্যরসিক। অভিনেতা হিসেবে যে খুব উচ্চস্তরের ছিলেন তা বলা যায় না। কিন্তু যত ছোট রোল তাকে দেওয়া হোক না কেন তিনি তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। তিনি প্রথমে নাট্যমন্দিরে নাটক করতেন, পরে ১৯৭০ সালে ত্রিতীর্থে যোগ দেন। ত্রিতীর্থে তাঁর প্রথম নাটক 'ছুটিরখেলা', 'নাট্যকারের সন্ধ্যানে ছ'টি চরিত্র', 'বিজ্ঞাপন', 'তিন বিজ্ঞানী', 'ভাঙ্গাপট', 'দেবীগর্জন', 'শিশুপাল' ও 'বল্লভপুরের

রূপকথা' তাঁর অভিনীত চরিত্র গুলির উপস্থাপন প্রশংসনীয়। যে কোনো চরিত্রে অভিনয়ে তিনি স্বচ্ছন্দ ছিলেন।

কালি হোড় (১৩৩০-১৪০০)ঃ

চিত্রশিল্পী। ছিপছিপে ছোটখাটো কালি হোড় অদ্ভুত স্বভাবের মানুষ, কখনো হুইল ছিপে মাছ ধরা, আবার কখনো খেলার মাঠে যুবাদের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া। পঞ্চাশের দশকে পাড়ায় পাড়ায় 'ফাংশানে' গান গাওয়া গজল, ঠুংরি, শ্যামা সঙ্গীত প্রভৃতি গানে শ্রোতাদের মন ভরিয়ে তুলত। বালুরঘাটের সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান ভোলার নয়। আন্তরিকতা দিয়ে লালন করে বালুরঘাটকে বাস যোগ্য করার পেঁছনে কালি হোড়ের অবদান রয়েছে। আদিবাড়ি বগুড়া শহরে, কাটনায়, পিতা বিখ্যাত চিত্রকর যোগেন্দ্র হোড়। তাঁর অঙ্কিত রীকালীমাতার বহুরূপের চিত্র চক্ভবানী বারোয়ারী কালীবাড়িতে এখনও সংরক্ষিত। প্রথাগত শিল্প শিক্ষা না থাকলেও পিতার কাছেই তাঁর প্রাথমিক পাঠ। পরে আত্মীয় কলকাতা নিবাসী প্রসিদ্ধ শিশু সাহিত্য ও শিল্প রচনাকার ধীরেন্দ্র নাথ বল মহাশয়ের নিকট শিল্প চর্চার পাশাপাশি সঙ্গীত চর্চাও চালান। এক সময় তিনি কলকাতার 'কারুকৃত' বিজ্ঞাপন সংস্থায় চিত্রকরও ছিলেন। দেশ বিভাগের পর পাকাপাকি ভাবে বালুরঘাটে বসবাস শুরু করেন। ছয়ের দশক থেকে সাতের দশক পর্যন্ত বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে তাঁর শ্রম ছিল অসাধারণ। ছবি আঁকার পাশাপাশি নাটকের 'সিন আঁকা', 'সেট-সেটিং', 'মেক-আপ', ছোট ছোট পার্টে অভিনয়ে অংশ নিতেন। '''ছেঁড়াতার' কালীদার অঙ্কন মাধুর্যে হীরক দ্যুতির বিচ্ছুরণ ঘটাতো। লম্বা বাঁশে জড়ানো নাটকের প্রতি দৃশ্যের মঞ্চ অলঙ্করণ নাটকটির বাস্তব অস্তিত্ব সদর্পে ঘোষণা করতো। বিশাল ক্যানভাসে শিল্প পরিকল্পনা এখনো অবাক করে।''[১০] সিরিওকমিক চরিত্রে অভিনয়টাও বেশভালো করতেন। গলায় তাঁর গুনগুন সুর আর হাতে তুলি ইনি কালি হোড়। পূজা মন্ডবের মন্ডপ ও চিত্রণ শিল্পে তাঁর ছিল বিশেষ নৈপুণ্য।

ভনা খাঁ (১৯২৪-১৯৯৮)ঃ ভনা খাঁর পরিবার ছিল সঙ্গীতজ্ঞ (কীর্তন)। ভনা খাঁও ভালো গান করতেন। ১৯২৪ সালে বালুরঘাটে জন্ম। বালুরঘাট হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ। তিনি নাট্য মন্দিরের আজীবন সদস্য ছিলেন। নাট্যমন্দিরে তাঁর অভিনীত নাটক- 'ছেঁড়াতার', 'ঝুমুর', 'বাঘিনী', 'গণদেবতা'(পন্তু), 'গণশার বিয়ে' প্রভৃতি নাটকে। 'ঝুমুর' নাটকের নির্দেশনা দিয়েছেন। তবে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার সাক্ষর রয়েছে মঞ্চ সজ্জায়। মঞ্চ সজ্জায় তাঁকে হার মানানোর মত কেউ ছিলনা। ভনা খাঁর মঞ্চ সজ্জা সম্পর্কে নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বলেছেন-'ভনাদা অভিনয়ে তেমন দক্ষ ছিলেন না। তাঁর দক্ষতা ছিল মঞ্চ নির্মাণে। আলোক সম্পাদেও তিনি সেই যুগে বৈপ্লবিক কান্ড করেছিলেন। হ্যাজাগ, ডে-লাইটে ঠুলি পড়িয়ে তখন Dark Shifting এর ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। এখন তুচ্ছ বলে মনে হলেও তখন সে সময় এমন কাজ দুর্দান্ত Innovation ছিল''[১১]। ১৯৯৮ সালের ১৪ই নভেম্বর পরলোক গমন করেন।

মন্টু দাস (১৩৩২ বঙ্গাব্দ)ঃ আত্ম ভোলা ভবঘুরে মন্টু দাস (সুরঞ্জন দাস) সঙ্গীত,নৃত্য, নাটক, অঙ্কণ শিল্পে ছিলেন অনুরাগী। আদি নিবাস ছিল ঢাকা বিক্রমপুরে। পিতা স্বর্ণশিল্পী হরেন্দ্র চন্দ্র দাস, মাতা সুন্দরমনি দেবী। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১৯শে মাঘ শুক্রবার মাঘি পূর্ণিমার

তিথিতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ঢাকা বিক্রমপুরের রুজদি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া বাড়িতে চলে আসেন এবং তিনি এখানে ফুলবাড়িয়া হাইস্কুলে আবার প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হন।সেখান থেকে তিনি সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। পড়াশোনায় তাঁর তেমন আকর্ষণ ছিল না। তাঁর আকর্ষণ ছিল সঙ্গীতের প্রতি। তাঁর মন কোথায়ও স্থির হয়ে থাকত না। তিনি নৃত্য শিল্পের দিকে ঝুকলেন। শ্রীহট্টের গুরু আদিশঙ্কর ভট্টাচার্যের কাছে নৃত্য শিক্ষা গ্রহণ করেন। নৃত্যজগতে তিনি বহু প্রশংসিত।

১৯৫৭ সালে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। কোথাও তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করেননি। মন্টু দাসের দাদা হারাণ দাস রেল ডিপার্টমেন্টে এ চাকরী করতেন। তাঁর উদ্যোগে তিনি রেল ডিপার্টমেন্টে এর একটি অনুষ্ঠানে নাচ করেন। তাঁর নাচে সন্তুষ্ট হয়ে রেলকর্তৃপক্ষ তাঁকে রেল ডিপার্টমেন্টে চাকরী দেন। কিন্তু সেই চাকরীও তিনি ছয়মাস পরে ছেড়ে দেন। যাত্রাশিল্পী কিশোরীমোহন বিশ্বাস, তুষার গুহ, ক্ষুদিরাম বোস তাঁকে আলিপুর দোয়ার জংশন থেকে বালুরঘাটে নিয়ে আসেন। ১৯৬২ সালে তিনি বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে যোগদেন। নাট্যমন্দিরে তিনি প্রধানত মেক-আপ দিতেন। মেক-আপ দেওয়ার পরে তিনি প্রয়োজনে ছোট খাট চরিত্রে অভিনয়ও করতেন। ৯২ বছর বয়স্ক মানুষটি এখনও প্রয়োজনে মেক-আপ করেন। সম্প্রতি 'শাস্তি' নাটকেও (নাট্যমন্দির) তিনি মেক-আপ দিয়েছেন। নাট্যমন্দির ছাড়া ত্রিতীর্থ, নাট্যতীর্থ, বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থাতে মেক-আপ এর কাজ করেছেন। সঙ্গীত প্রিয় মানুষটি বেহালা, খোল, তবলচি, ঢোলক, মৃদঙ্গ, এসরাজ প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র বাজাতে পারেন। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের সময় তিনি লঙ্গর খানায় খিচুরী রান্না করে মানুষকে খাইয়েছেন। ১৯৬৬ সালে তিনি কলকাতায় যান, সেখানে তিনি বিভিন্ন যাত্রা দলে অভিনয় করেছেন। রঞ্জন অপেরা, নাট্যভারতী অপেরা, সত্যম্বর, নবযুগ নাট্যসংসদ, রয়াল বিনাপাণি, ভোলানাথ ইত্যাদি যাত্রা কোম্পানীতে তিনি অভিনয় করেছেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি কোথায় স্থির হয়ে থাকতে পারতেন না- এমনি চঞ্চল তাঁর মন। তিনি শ্রেষ্ঠ নৃত্য শিল্পী হিসেবে দু'বার পুরস্কৃত হয়েছেন-

১। পশ্চিম দিনাজপুর যাত্রা উৎসব ১৯৭৩।

২। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্য সংযোগ বিভাগ, পশ্চিম দিনাজপুর-১৯৭৪।

এমন একজন প্রতিভাবান শিল্পী এখন আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্চেন। নাট্যমন্দিরের পক্ষ থেকে প্রতিবছর বয়স্ক ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও আজ পর্যন্ত তিনি তা পাননি। তবে এককালীন ১২,০০০.০০ (বার হাজার) টাকা নাট্যমন্দির মন্টু দাসকে দিয়েছে। বর্তমানে তিনি টিনের ছাউনি মাটির ঘরে দিন কাটাচ্ছেন। অথচ একটা সময়ে তার শ্রমে, শিল্পীর মনের রং এ নাট্য জগত কত উপকৃত হয়েছিল।

শান্তিরঞ্জন গুহ (১৯২৬-১৯৮৫)ঃ

শান্তিরঞ্জন গুহ (ছানা গুহ) বালুরঘাটের নাট্যজগতে ছিলেন অপরিহার্য। বাংলাদেশের রাজশাহীতে ১৮/০৬/১৯২৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা উমেশ চন্দ্র গুহ, মাতা শৈল্যবালা দেবী। তিনি নন ম্যাট্রিক। খেলাধুলায় ভালো ছিলেন। খেলাধুলার সুবাদে তিনি বালুরঘাট কালেক্টরেটে ক্লারিক্যাল পোষ্টে চাকরী পান। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নাটক করতেন। ১৯৪৮ সালে নাট্য মন্দিরে প্রবেশ করেন। নাট্যমন্দিরে

অভিনয় করতেন এবং তিনি অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী তৈরিও করেছেন। নাট্যমন্দিরে তিনি করেন 'মাটির ঘর'(ছন্দ্রা/তন্দ্রা), 'মেঘমুক্তি'(নায়িকা), 'ফেরারী ফৌজ' (শান্তি রায়), 'শান্তি' (বড় ভাই), 'গনশার বিয়ে', 'পি ডল্লু ডি', 'মমতাময়ী হাসপাতাল', কালিন্দী ' প্রভৃতি। ত্রিতীর্থের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ত্রিতীর্থে করেন 'মঙ্গলাচরণের বিবাহ', 'ভাঙ্গাপট', 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'দেবীগর্জন' প্রভৃতি। ত্রিতীর্থ সংস্থায় তিনি দুটি নাটকের পরিচালনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। একক ভাবে 'রাজযোটক'(১৯৭০) অপরটি 'ভাঙ্গাপট' হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথ ভাবে। 'The Broken jug' নাটকটি বাংলানুবাদ করেছিলেন নীহাররঞ্জন ভট্ট াচার্য। 'ভাঙ্গাপট' নামে নাটকটি দক্ষিণ দিনাজপুরের আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তর করেন শান্তিরঞ্জন গুহ ও ও সত্যরঞ্জন তালুকদার। শান্তিরঞ্জন গুহের অভিনয় সম্পর্কে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বলেছেন-''শান্তিরঞ্জন গুহকে আমি প্রথম দেখি নারী চরিত্রে ... ছিপছিপে চেহারা, ফর্সারঙ্ ছানাদা বেশ সুপুরষ ছিলেন। পরে ছানাদাও Serio Comic actor হিসেবে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। .. ছানাদার ছিল অসামান্য Reflex fluid tongue এ জল ভাতের মত স্বচ্ছন্দে অনায়াসে সংলাপ বলতেন। 'ফেরারী ফৌজ' ছানাদার অভিনয় খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে আমি দ্বিমত পোষণ করি। বস্তুত শান্তি রায় চরিত্রটির দুটি পর্ব- প্রথম পর্বে ছানাদা খুবই চমৎকার- কিন্তু exposition পর্বে অর্থাৎ বিপ্লবী নেতার অংশটিতে যে Sudden metomorphosis সেখানে ছানাদা যথেষ্ট যোগ্য ও স্বার্থক নয়। ছানাদার Achivement মূলত ত্রিতীর্থে যেখানে অনেক চরিত্রে ছানাদা শ্রদ্ধেয় বিজন ভট্টাচার্য এবং কোলকাতার critic দের কাছে যে সম্মানও প্রশংসা পেয়েছে .....''[১২]।

পুলক নিয়োগী (১৯২৬-১৯৮৭)ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের ভূমিপুত্র পুলক নিয়োগী। বর্ধিষ্ণু পরিবারে জন্ম। বাবা হরিমোহন নিয়োগী ছিলেন পাইকবান্ধার (বর্তমানে বাংলাদেশ) জোতদার। ১৯২৬ সালে পুলক নিয়োগীর জন্ম। পুলক নিয়োগী নামে তিনি পরিচিত তবে তাঁর আসল নাম চিত্তরঞ্জন নিয়োগী। পারিবারিক ডাক নাম দানি। তিনি যখন ক্লাস সেভেনে পড়েন তখন তাঁর সেতার বাজানোর প্রতি ঝোঁক আসে। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় এর কাছ থেকে তাঁর হাতে খঁড়ি। ফটিক ব্যানার্জীর কাছে বেশ কিছুদিন সেতার বাজানোর তামিল নেয়। তারপর একক চেষ্টায় তিনি ধীরে ধীরে সেতার বাদক হয়ে ওঠে। সেতারের নেশায় তাঁর পড়াশোনায় ভাটা পড়ে। বালুরঘাট হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকের টেষ্ট পরীক্ষা দেয়। তৎকালে নাটকের ক্ষেত্রে সেতার ছিল অপরিহার্য। ১৯৫০ সালে নাট্যমন্দিরের সদস্য হন। আবহ সঙ্গীতে পুলক নিয়োগীর সেতারের অপূর্ব মূর্ছনা থিয়েটার দর্শকদের একটা বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল। বিনম্র স্বভাব, পরোপকারী, ধীর ও মৃদুভাষী সবার কাছেই সমান প্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৮৭ সালে জুলাই মাসে তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

অধীর বিশ্বাস(১৯২৮-১৯৭১)ঃ অধীর বিশ্বাস নদীয়া জেলার হোগল বেড়িয়া গ্রামে আনুমানিক ১৯২৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা বসন্ত কুমার বিশ্বাস, মাতা সরষি বালা দেবী। প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয় বালুরঘাট হাইস্কুলে। সেকেন্ডারী পাশ করেন বাংলাদেশের রংপুর থেকে। আই.এ. বালুরঘাট কলেজ থেকে। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান করণিক। ১৯৫৭ সালে তিনি নাট্যমন্দিরে যোগদেন। তিনি নাট্যমন্দিরের আমরণ সদস্য ছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা ছিলেন। তিনি ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। স্বাধীনতা

সংগ্রামী ছিলেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে বহুবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

কান্তিভূষণ চক্রবর্তী (১৯২৮---)ঃ

বংশী বাদক কান্তিভূষণ চক্রবর্তী ১৯২৮ সালে বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার জনাদি থানার পারুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, মাতা বিন্দু বাসিনী চক্রবর্তী। তাঁর মেজদাদা বাঁশি বাজাতেন, সেই শুনে তাঁর বাঁশি বাজানোর প্রতি আগ্রহ হয়। কান্তিভূষণ চক্রবর্তীর কোন গুরু ছিল না। তাঁর কানই তাঁর গুরু ছিল। তিনি প্রথমে পুলিশে পরে কালেক্টরেটে সাধারণ প্রশাসনিক ভবনে বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরী করেছেন। তিনি ১৯৫৪ সালে ৯ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ছেড়ে বালুরঘাটে চলে আসেন। নাট্যমন্দিরের বেশির ভাগ নাটকের সঙ্গীত পরিচালনা তিনি করতেন। ১৯৮২ সালে তিনি সাধারণ সম্পাদক হন। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় আমন্ত্রিত হয়ে বাঁশি বাজিয়ে শ্রোতাদের মন জয় করেছেন। 'সুর ও সংহতি' নামে একটি সংস্থা ছিল যার সম্পাদক ছিলেন কান্তিভূষণ চক্রবর্তী।

নিমু রায় (১৯২৯-১৯৯৪)ঃ

ভালো নাম নির্মলেন্দু রায়। প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা দেবল রায়ের দাদা। ১৯২৯ সালে অধুনা বাংলা দেশের পাবনা জেলায় জন্ম। পিতা পূর্ণেন্দু কৃষ্ণ রায়, মাতা প্রীতিরাণী দেবী। ম্যাট্রিক পাশ। জজমানি করতেন কিন্তু তাঁর নাটক ছিল প্রধান। নিমু রায় ছিলেন কমেডিয়ান, সিরিয়াসেও সমান। নাট্যমন্দিরে তিনি করেছেন 'দেবলা দেবী', 'মহুয়া', 'খনা', 'সাজাহান', 'টিপুসুলতান', 'সারথীকৃষ্ণ', 'কংকাবতীর ঘাট', 'কালপুরুষ', 'তাহার নামটি রঞ্জনা', 'ছেঁড়াতার', 'ঝুমুর', 'নীলদর্পণ' প্রভৃতি।

মন্টু অধিকারী (১৯৩২-২০১৩)ঃ

মেক-আপ ম্যান ও অভিনেতা মন্টু অধিকারী ১৯৩২ সালে ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহগ্রামে জন্ম। ১৯৫০ সালে শান্তাহারের যুদ্ধের সময় পৈতৃক ভিটা ছেড়ে বালুরঘাটে চলে আসেন সপরিবারে। তিনি ম্যাট্রিক পাশ। পূর্ববঙ্গ থেকে বালুরঘাটে আসার পর খুব কষ্টে দিন যাপন করতেন। পেপার বিক্রি, বরফ বিক্রি, পানের দোকান করেছেন। তারপর ডি.এম. অফিসে ক্লারিক্যাল পোষ্টে যোগদান করেন। মন্টু অধিকারীর বাবা একজন শিল্পী মানুষ ছিলেন। মন্টু অধিকারীর শিল্পী প্রতিভা ছিল সহজাত। কিশোরী বিশ্বাসের যাত্রা দলে অপেশাদার অভিনেতা হিসেবে তিনি প্রবেশ করেন। কিশোরী বিশ্বাসের যাত্রা দলে নিজের মেক-আপ নিজেকেই করতে হত, সেই শুরু হল তাঁর মেক-আপের জগতে প্রবেশ। প্রাথমিক ভাবে নিজের মেক-আপ করার সুবাদেই তিনি এর মাঝে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। হাতে ধরে তাঁকে কেউ মেক-আপ শেখায়নি। নিজের মেক-আপ নিজে করতে করতে এবং বই পড়ে তিনি দক্ষ মেক-আপম্যান হয়ে উঠেছিলেন। কাশী ঘোষাল তাঁর প্রেরণা ছিল। তিনি ভালো অভিনেতাও ছিলেন, সামাজিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সমস্ত পালাতেই তিনি দক্ষ অভিনয় করতেন। কিশোরী বিশ্বাস কলকাতার নামীদামী অভিনেতাদের নিয়ে 'নিউ বাসন্তী অপেরা' গঠন করেন। কিশোরী বিশ্বাসের যাত্রাদলে তিনি দশ বছর ম্যানেজারী করেন। মন্টু অধিকারী চাকুরীতে ছুটি নিয়ে উত্তরবঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন জেলায় অভিনয় করতেন। তিনি বাসন্তী অপেরা ছাড়াও 'নাট্যমন্দির', 'নাট্যতীর্থ', 'বেয়ালদাড় বরোয়ারী নাট্যসংস্থা'য়

মেক-আপের কাজ করেছেন। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন মেক-আপের কাজ করে গেছেন। ২০১৩ সালের ৯ই এপ্রিল নিজ বাসভবনে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

নালু পাল (১৩৩৯-১৪০৭)ঃ

প্রকৃত নাম বিনয়ভূষণ পাল। পিতা ভূবন মোহন পাল, পিতামহ বিখ্যাত গৌরী পাল। জমিদার পরিবার। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে বগুড়াতে জন্ম গ্রহণ। তাঁর যখন দেড় বছর বয়স তখন মা মারা যান এবং ৪বছর বয়সের সময় বাবা মারা যান। তখন থেকে তিনি মাতুলালয়ে বড় হন। তিন ভাই সকলেই সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তি ছিলেন। নালু পালের পড়াশোনা ম্যাট্রিক পর্যন্ত। জমিদারী ছিল সে কারণে সরকারী চাকরী করেননি। নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়েই থাকতেন। বালুরঘাটে আদি সাইন বোর্ড চিত্রকরদের অন্যতম। ছবি অঙ্কনেও তাঁর পারদর্শিতা পরিলক্ষিত বিশেষ করে সাইন বোর্ডে। ১৭ বছর বয়সে তিনি বালুরঘাটে চলে আসেন। তিনি অভিনয়ও করতেন। প্রাচ্যভারতী ক্লাবের পক্ষ থেকে তিনি প্রথমে নাটক করতেন। দীর্ঘদীন প্রাচ্যভারতী ক্লাবের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অভিনয় করলেও তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন যে জন্য সেটা হল পোষ্টার, আর্ট, মেক-আপ, মঞ্চসজ্জা। ১৯৫২ সালে নালু পাল নাট্যমন্দিরের সদস্য হন। তিনি বালুরঘাটের নাট্য জগতে কয়েকদশক ধরে মেক-আপ, সেট-সেটিং, ব্যানার এর কাজ করেছেন। শুধু বালুরঘাটে নয়, বালুরঘাটের বাইরেও তিনি মেক-আপ এর কাজ করেছেন। সংস্কৃতির শহর বালুরঘাট, বহু পূর্বে দিপালী উৎসব হত। সেই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে একটি রূপসজ্জা। সেখানে বালুরঘাটের বাইরে লোকও প্রতিযোগিতায় আসত। এই প্রতিযোগিতায় তিনি একজনকেই সাজাতেন। তিনি ভালো ফটোগ্রাফারও ছিলেন। নালু পাল সম্পর্কে নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বলেছেন-'নালু পাল মই এর ওপর দাঁড়িয়ে রঙ তুলি নিয়ে নাটকের মূল অভিনেতাদের, নাটকের নাম... কী আশ্চর্য ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং প্ররিশ্রমে নানা রঙে ছবি আঁকাতেন। কী ঈর্শনীয় দক্ষতায় তুলির আঁকের আঁচড়গুলো ধীরে ধীরে ... দিনে দিনে ছবি হয়ে উঠতো। শুনেছি বিখ্যাত চিত্র শিল্পী হুসেন জীবন প্রারম্ভে উপার্জনের জন্য এমনটা করতেন। হুসেন তো বিখ্যাত, নালু পালকে ক'জন চেনেন, তাঁর নাম জানেন। স্কুলে যাতায়াতের পথে প্রতিদিন দেখতাম কেমন করে দুলু সেন কিংবা ফণী মুখার্জী দিনে দিনে রঙ তুলির আঁচরে সম্রাট মন্ত্রী হয়ে উঠছেন, দেওয়ালে বন্দী জীবন্ত নাটকের চরিত্র হয়ে উঠেছেন।''[১৩] ১৪০৭ বঙ্গাব্দের ২৯শে আষাঢ় তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

অমিতাভ সেনগুপ্ত, দুলু (১১.০৩.১৯৩৩---)ঃ

পিতা ধ্রুব সেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা ম্যাট্রিকুলেশন। চাকরিজীবি ছিলেন। ১৯৫১সালে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে যোগ দেন। এখানে তিনি ধারাবাহিক ভাবে ১৮ বছর নাট্যমন্দিরের সদস্য হিসেবে নাট্যাভিনয়ের দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'কালিন্দী', 'কঙ্কাবতীর ঘাট', 'ফেরারী ফৌজ', 'গৃহপ্রবেশ' প্রভৃতি নাটকে উল্লেখযোগ্য অভিনয়। ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ত্রিতীর্থে তাঁর অভিনীত নাটক 'অমৃতস্য পুত্রা', (সনাতন), 'শের আফগান', 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র', 'তিন বিজ্ঞানী'(মফিজ), 'মঙ্গলাচরণের বিবাহ' ইত্যাদি নাটকে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। সাতের দশকের শেষ ভাগে তিনি অভিনয় জগৎ থেকে সরে আসেন।

সুনির্মল সরকার (১৯৩৩-২০০৮)ঃ

সুনির্মল সরকার সুঅভিনেতা ছিলেন। সঙ্গে তিনি আলোর কাজও করতেন এবং নাট্যমন্দিরের কার্যকরী কমিটিতে একাধিকবার সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৫৩ সালে নাট্যমন্দিরের সদস্যহন। সেই সময় থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত নাট্য মন্দিরের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৩৩ সালের ১৯শে চৈত্র বালুরঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা শম্ভুনাথ সরকার, মাতা কালিদাসী দেবী। বালুরঘাট হাইস্কুল থেকে প্রাথমিক এবং এখান থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেন। তিনি ছিলেন কৃষি নির্ভর। ত্রিতীর্থের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন সুনির্মল সরকার। ত্রিতীর্থে অভিনয় ও আলোর কাজ করেছেন। 'অমৃতস্যপুত্রা' (অজিত), 'জল' (সরকারী অফিসার) প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছেন। তাঁর প্রয়াণ দিবস ৪ঠা ডিসেম্বর ২০০৮।

অর্ধেন্দু সরকার (১১.১২.১৯৩৩- ২০১৫)ঃ

অর্ধেন্দু সরকার ১৯৫৭ সালে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করেন। ১৯৬৩ সালে নাট্য মন্দিরের কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। সুঅভিনেতা ছিলেন। পিতা মনীন্দ্র নাথ সরকার। তিনি স্কুল ফাইনাল পাশ। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত নাট্যমন্দিরের সক্রিয় কর্মী ও অভিনেতা ছিলেন। ত্রিতীর্থ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তিনি ত্রিতীর্থ এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বহু নাটকে তিনি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য 'দেবীগর্জন'(মনা), 'জল' (অতন), 'ভাঙ্গাপট', 'পণন'(বাবা), 'দেবাংশী', (বিরামের চ্যালা, বনমালী), 'বিছন'(করমী), মন্ত্রশক্তি' প্রভৃতি ২০১৫ সালে ১০শে জানুয়ারী পরলোক গমন করেন।

সনৎ সেন-(১৯৩৩-..)ঃ-

বালুরঘাটের নাট্যজগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের মধ্যে একজন অন্যতম অভিনেতা হলেন সনৎ সেন। বহুগুনের সমাবেশ গুনান্বিত অভিনেতা সনৎ সেন। ছোট থেকেই আবৃতি, খেলাধুলা, অভিনয় তাঁর রক্তে মিশে গিয়েছিল। পিতা ননি গোপাল সেন, মাতা কমল কুমারী দেবী। তিন ভাই এর মধ্যে সকলেই অল্পবিস্তার অভিনয় করতেন, নাটক ভালোবাসতেন। কিন্তু সনৎ সেন নাট্য ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন এবং তিনি পুরস্কৃতও হয়েছেন। বালুরঘাট হাইস্কুল থেকে প্রাথমিক ও ম্যাট্রিকের গন্ডি পেড়িয়ে কলকাতার সি.টি. কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক হন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের বালুরঘাট শাখায়। বালুরঘাট নাট্য মন্দিরে তিনি ১৯৫৪ সালে যোগদেন। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি বালুরঘাটের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি নাট্য মন্দিরের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তিনি যেমন অভিনয়ে দক্ষ ছিলেন তেমনি নির্দেশনায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিনীত নাটকগুলি হল-'উল্কা'(বিকৃত অরুনাংশু), 'ফেরারী ফৌজ' (দারোগা), 'ফেরা'(ঋত্বিক), 'ছেঁড়াতার', 'তাহার নামটি রঞ্জনা'(কৌশিক), 'লৌহকপাট', 'বিশ বছর আগে', 'মমতাময়ী হাসপাতাল', 'ঋনং কৃত্বা ঘৃতং পীবেত', 'পথেরদাবী' ।

তাঁর পরিচালন ক্ষমতা ছিল অসীম। তিনি বহু নাটক পরিচালনা করেছেন। 'ফেরা', 'লৌহকপাট', 'পাপপূণ্য' তাহার নামটি রঞ্জনা, ছেঁড়াতার প্রভৃতি তাঁর মঞ্চ সফল ও বহু প্রশংসিত প্রযোজনা।

১৯৬৯ সালে সারা ভারত পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায় সনৎ সেনের পরিচালনায় বালুরঘাট নাট্যমন্দির চারটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পায় (শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী)। ১৯৬৯ সালে 'সারা বাংলা শিশির একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় তাঁর পরিচালনায় 'তাহার নামটি রঞ্জনা' পুরস্কৃত হয়। (শ্রেষ্ঠ দল, শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, তৃতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা)।

পবিত্র দে (১৩৪১-১৪০৫)ঃ

'বালুরঘাট নাট্যতীর্থে'র জন্ম লগ্ন থেকে যে কয়েকজন হার না মানা নাট্যপ্রেমী সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার তারণায় নতুন নাট্যসংস্থা গঠনের সুস্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁদেরই একজন ছিলেন পবিত্র দে। ১৩৪১ সালের ২১শে চৈত্র চকভবানীতে মামা গিরীজা দাসের নিজ বাসভবনে জন্ম। পিতা হরিদাস দে এবং মাতা শান্তিরাণী দেবী। নতুন নাট্যসংস্থা নাট্যতীর্থের প্রারম্ভিক সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। পর্দার আড়ালে যে কোনো দায়িত্ব পালন থেকে শুরু করে কাউন্টারে টিকিট বিক্রি করা, কখনো টিমের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রতিদিন নাটকের মহড়ায় উপস্থিত থাকতেন। একজন অনুকরণযোগ্য নাট্যকর্মী ছিলেন পবিত্র দে। ১৪০৫ সালে ১২ই আশ্বিন দেহ ত্যাগ করেন।

কানাই দত্ত (১৯৩৪-১৯৯১)ঃ-

ত্রিশূল (১৯৫৯-৬০) নাট্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেন কানাই দত্ত। বালুরঘাট শহরে কানাই দত্তের পাঁচপুরুষ ধরে বাস। ১৯৩৪ সালের ৪ই সেপ্টেম্বর বালুরঘাট শহরে জন্ম। বালুরঘাট হাইস্কুলে প্রাথমিক থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালোছিল না বলে ১৯৫২ সালে চাকরীতে যোগদেন Settlement অফিসে B.L.& L.R.O. পদে। ছেলে বেলা থেকেই নাটকের প্রতি তাঁর অণুরাগ ছিল প্রবল। তাঁর বাড়ির সামনে ফাঁকা জায়গা ছিল সেখানে অবিনাশ দত্ত কানাই দত্ত ও সত্যরঞ্জন তালুকদার মিলে নাটক করতেন। ১৯৫০ সালে তিনি নাট্যমন্দিরে আরো নাটকের অভিনয় করেছেন কিন্তু সংগ্রহ করা যায়নি। বন্ধু অবিনাশ দত্তের সঙ্গে গড়ে তোলেন ত্রিশূল (১৯৫৯) নাট্য সংস্থা। ত্রিশূলে পরিচালনা ও অভিনয় করেছেন।

''বিসপস ক্যান্ডেল স্টিক'' নাটকটির অভিনয়ে তিনি 'গোল্ড মেডেল' পান ১৯৫৬-১৯৫৭ এর দিকে। 'ত্রিতীর্থ' (১৯৬৯) নাট্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন তিনি। বহুদিন এই সংস্থার সম্পাদকও ছিলেন। ত্রিতীর্থেও বহু চরিত্রের রূপদান করেছেন। 'গ্যালিলেও গ্যালিলেই' (ক্রীষ্টাফার ক্লাডিউস) 'অমৃতস্য পুত্রা: (অধ্যাপক), ক্ষুরস্যধারা' (শেখর দা), বল্লভপুরের রূপকথা (সাহা), 'জল' (উচ্চবর্ণ হিন্দু), তুঘলক (বরণী) প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছেন। ১৯৯১ সালে ১৮ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন।

মানস সেন (১৯৩৪-১৯৯২)ঃ

মানস সেন নাটকে বড় চরিত্রে অভিনয় করেননি। কিন্তু নাটকের সমস্ত ব্যাপারে তিনি নিজেকে জড়িয়ে রাখতেন। ১৯৫৫ সালে নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করেন। নেপথ্য কর্মী হিসেবে সকল কাজ তিনি করতেন। তিনি কথা কম বলতেন ঠিকই কিন্তু তাঁর ভেতর কথা থরে থরে সাজানো থাকত। একবার যদি খোঁচা খেয়ে কথা বেড়িয়ে আসত তাহলে সকলের শরীর

হাসির দমকে নেচে উঠত। ১৯৩৪ সালের ২৬শে অক্টোবর জন্ম। পিতা কৃষ্ণপদ সেন। মানস সেন চাকরীজীবি ছিলেন। নাট্যমন্দিরে থাকাকালীন ছোট ছোট চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি। ত্রিতীর্থেও মঞ্চের নেপথ্যের কাজ করেছেন। বিশেষ করে আবহসঙ্গীত প্রক্ষেপণ। এ কাজে তিনি দক্ষ ছিলেন। 'তিন বিজ্ঞানী' ও 'বন্দীর সম্রাট' নাটক দুটিতে যোগ্যতার সঙ্গে আবহসংগীত প্রক্ষেপণের কাজ করেছেন।

শান্তি খাঁ (১৯৩৪-২০০৯)ঃ

বালুরঘাটের পাচের দশকের অভিনেত্রী শান্তি খাঁ। তিনি বহু গুনান্বিত এবং উদার প্রকৃতির ছিলেন। নাটক, গান, নাচ সবেতেই তিনি সমান আগ্রহী এবং উদার ভাবে সকলকে উৎসাহ দিতেন। ১৯৩৪ সালে অক্টোবর মাসে বাংলাদেশের ঢাকা শহরে জন্ম। পিতা শচীন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত, মাতা নীলাবতী দেবী। বগুড়া থেকে প্রাথমিক ও ম্যাট্রিক পাশ করেন। ঢাকা ইডেন কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট। পিতা বালুরঘাটের পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন। বি.এ. পাশ করার পর বালুরঘাটে চলে আসেন। স্বামী ভনা খাঁ নাট্যমন্দিরের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ভনা খাঁ (বীরেন্দ্র নাথ খাঁ) হাত ধরেই তিনি নাট্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। প্রথমে হিলি গার্লস হাইস্কুলে তার পর বালুরঘাট গার্লস হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং সবশেষে কালেক্টরীতে চারকী করেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে শুধু নির্মল আনন্দ পাবার উদ্দেশ্যে নাটক করতেন।

তিনি নাট্য মন্দিরে বহু নাটকে অভিনয় করেছেন কিন্তু নাটকের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কারণ আটের দশকের পূর্বে নাট্যমন্দিরের কোনো লিখিত দলিল নেই। শান্তি খাঁর ছেলে দেবাশীষ খাঁ তিনি গুণী ব্যক্তি। তাঁর মায়ের একটি মেডেল দেখিয়েছিলেন।। সেখানে লেখাছিল ''১৯৬১ সাল, একাঙ্ক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী''। কিন্তু কোন্ নাটক, কোন্ সংস্থার প্রযোজনা তা জানা যায়নি। তবে অভিনেত্রী শান্তি খাঁ উল্লেখ করেছেন ''ভবেশ সরকারের লেখা স্ক্রিপ্ট 'ত্রিধারা' কোন এক কমপিটিশনে মঞ্চস্থ হয়েছিল। আমার স্বামীই মঞ্চে স্বামী হয়েছিল। আর সুনীল (খাঁ) দেওয়ের পার্ট করেছিলেন। নির্দেশনা ভবেশ সরকারেরই। এতে আমি মেডেল পেয়েছিলাম।''[১৪]

মমতা চ্যাটার্জী (১৯৩৪---)ঃ

বহু গুণের অধিকারী মমতা চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৪ সালের ৭ই নভেম্বর বালুরঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সতীশ রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। মাতা সরলা দেবী। খাদিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর শোভা মজুমদার তাঁকে বালুরঘাট গার্লসে নিয়ে আসেন এবং এখান থেকেই তিনি ১৯৯৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। নিজেদের বাড়িতেই মঞ্চ বেঁধে নাটক করতেন পাড়ার মেয়েরা। সেখান থেকেই তাঁর নাটকের আকর্ষণ। তাঁর প্রথম নাটক বালুরঘাট মহিলা সমিতি পরিচালিত 'ধাত্রীপন্না' নাটকে। কলেজে করেছেন ১৯৫৩ সালে 'বিসর্জন'(জয় সিংহ) এবং 'রক্তকবরী'। 'ত্রিতীর্থ' নাট্য সংস্থায় প্রবেশ করে তিনি অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 'তিন বিজ্ঞানী' নাটকে ড.ঝা চরিত্রে অভিনয় করে সাড়া ফেলে দেন।

সুধন ভট্টাচার্য (১৯৩৪-১৯৯৬)ঃ

ডাক নাম আহ। ১০/১১/১৯৩৪ সালে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চাঁদ পুরে জন্ম

গ্রহণ করেন। পিতা রেবতী নাথ ভট্টাচার্য। চাকুরী সূত্রে বালুরঘাটে এসে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রথমে নাটকের আড্ডায়, পরে মঞ্চে আকৃষ্ট হন। ত্রিতীর্থ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ওই সংস্থায় যোগ দেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সদস্য ছিলেন। ত্রিতীর্থে তাঁর অভিনীত নাটক গুলি হল 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' (কুলি), 'ভাঙ্গাপট' (মুসলমান গ্রামবাসী), 'বিজ্ঞাপন' (সাধু), 'দেবাংশী' (বিরাম গুনমান), 'বল্লভপুরের রূপকথা' (পবন), 'মন্ত্রশক্তি' (আলি সাহেব), 'বিছন' (লটবর)। চাকরীতে অবসর গ্রহণের পর কলকাতায় যান এবং সেখানেই ২১/০১/১৯৯৬ এ দেহত্যাগ করেন।

মিহিরবরণ মুখার্জ্জীঃ-(১৯৩৫ -)

নাট্যমন্দিরের একজন সুদক্ষ অভিনেতা হলেন মিহিরবরণ মুখার্জ্জী। নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য উমেশ ব্যনার্জ্জীর আত্মীয় হলেন মিহিরবরণ মুখার্জী। বালুরঘাটে মাতুলালয় ১৯৩৫ সালের ১৫ অক্টোবর তাঁর জন্ম ।পিতা হরিদাস মুখার্জ্জী মাতা স্নেহলতা দেবী তাঁর আদিবাসস্থান বাংলাদেশের রংপুরে। রংপুর মাহিগঞ্জ প্রি-প্রাইমারি বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পাশ করে এসে বালুরঘাট হাইস্কুলে ভর্তি হন।১৯৫৩ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন তারপর প্রাইভেটে I.A, B.A. পাশ করেন এবং Settlement এ চাকরী পান। চাকুরী সূত্রে তিনি মালদা থাকাকালীন পরিচয় হয় আলোক শিল্পী পুরুষোত্তম সোহানী। পুরুষোত্তম সোহানী বালুরঘাটে নাট্য জগতে আলোর বিল্পব ঘটিয়েছিলেন। মামারা ছিলেন নাট্যামোদী (নরেশ ব্যানার্জ্জী, ভবেশ ব্যানার্জ্জী)। তাঁদের প্রেরণায় তিনি নাট্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ১৯৫৬ সালে অবিনাশ দত্ত তাঁকে নাট্য মন্দিরের সদস্য করে দেন। তিনি নাট্য মন্দির কখোনো ত্যাগ করেননি। নাট্যমন্দিরে তিনি ১৫-১৬ টি নাটকে অভিনয় করেছেন। 'ফেরারী ফৌজ','নীলদর্পন', 'ছেঁড়াতার' তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিনীত নাটক। কলকাতা,পাটনা, শিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থানে গেছে অভিনয়ের সুবাদে।

দেবল রায় (১৯৩৬-২০০৯)ঃ

দেবল রায় সম্পূর্ণ একজন মঞ্চ মানুষ। বালুরঘাটের নাট্য বাতাবরণে দেবল রায়ের ভূমিকা অনিবার্য। পূর্ব পাকিস্থানের (বর্তমান বাংলাদেশ) পাবনা জেলার খেতু পাড়ার রায় পরিবারে তাঁর জন্ম ৩০.০১.১৯৯৬ সালে। পিতা পূর্ণেন্দু কৃষ্ণ রায়, মাতা প্রীতিরাণী দেবী। বাল্যকালে তিনি পিতামাতা সহ চলে আসেন বালুরঘাটে। পিতা পূর্ণেন্দু কৃষ্ণ রায়ের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তিনি নন ম্যাট্রিক। দেবল রায়েরা ছয় ভাই ছিলেন সকলেই নাটকের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বালুরঘাটের নাট্য ইতিহাসে রায় পরিবাররের অবদানের কথা অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। মেজদাদা নিমু রায় ছিলেন সিরিয়াস অভিনেতা।

দীর্ঘ দেহী, গৌরকান্তি, তীক্ষ্ননাসা দেবলদা ছিলেন সত্যিকারের এক নায়কোচিত সুপুরষ। দর্শনীয় চেহারার জন্য কোনো না কোনো চরিত্র তিনি অবশ্যই পেতেন। সরল, উদার মনের মানুষ দেবল রায় ছোট বয়স থেকেই খেলাধুলা নাটক করা, দরিদ্র পরিবারের সাহায্য করা ছিল তাঁর নৈমিত্তিক ব্যাপার। তাঁর প্রকৃত নাম উৎপলেন্দু রায়। কিন্তু জেলাবাসীর কাছে তিনি ছিলেন 'দেবলদা'। তিনি ১৯৫৪ সালে নাট্যমন্দিরের সদস্য হন। নাট্যমন্দিরে তিনি করেছেন-'দুই মহল'(ছোনেরাম), 'উল্কা' (তোপে), 'টিপু সুলতান' (মাঁসিয়ে লালি),

'কালিন্দী' (ননীপাল), 'নীলদর্পন' (রোগ সাহেব), 'ছেঁড়াতার' (কানা ফকির), 'ড. ফ্যাস্টাস' (লুসিকার), 'অমৃতস্য পুত্রা:' (সজ্জন), মারীচ সংবাদ'(ওস্তাদ), 'কালাবদর' (ভূষণ মন্ডল), 'কর্ণাজুন' (অর্জুন), 'কেদার রায়'(নাম ভূমিকা), 'করুণা কোর না'(পুটিরাম হালুই), 'শেষ থেকে শুরু' (প্রভাত ঘোষাল), 'কঙ্কাবতীর ঘাট' প্রভৃতি। ১৯৮২ সালে নাট্যতীর্থ নাট্য সংস্থার প্রতিষ্ঠা সদস্য। এখানে তিনি করেছেন-'দানসাগর' (কত্তাবাবু), 'কালাবদর'(ভূষণ), 'কানামামা'(বনমালী), 'সাজানো বাগান'(ন-কড়ি দত্ত), 'য্যায়সা কা ত্যায়সা'(হারাধন), 'মহাযুদ্ধ'(নিষাদ)। কোনো মত বা পথে নিজেকে কখনো আটকে রাখেননি। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতেন। দেবল রায় জানিয়েছিলেন-''কেতাবের তত্ত্ব জানিনা। তবে এটা অবশ্যই জানি এবং মানি যে থিয়েটারে মানুষের উপকার হয়। তবেই না শুধুমাত্র হিরো সেজে ঘাড়ে পাউডার না মেখে সারাদিন ঘাড়ে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে শহরময় প্রচার চালিয়ে মঞ্চের খুটি নাটি কাজ সেরে, তারপর অভিনয় করতে নামতাম। যত ছোট ভূমিকাই হোক, চেষ্টা করেছি সম্পুর্ণ ক্ষমতা দিয়েই চরিত্রটাকে বিশ্বাসযাগ্য করে উপস্থাপিত করতে।''[১৫] বালুরঘাটের কিশোরী মোহন বিশ্বাসের যাত্রাদল উত্তরবঙ্গ বিস্তার করেছিল। কিশোরী মোহনের যাত্রা দলে যোগ দিয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন প্রধান অভিনেতা। সংসারের খারাপ অবস্থার জন্য শেষের দিকে যাত্রাদলের মালিকের থেকে অর্থ নিতেন। তিনি ছোট একটি চাকুরী করতেন কিন্তু যাত্রা নাটক করার জন্য কখনো নিজের অফিসের কাজ অবহেলা করতেন না। সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে তাঁর অভিনয়ের খ্যাতি ছিল। নিরহংকার ও অভিমানী এই মানুষটার কিছু ব্যক্তিগত দু:খবোধ ছিল। সমগ্র অভিনয় জীবনে তিনি কোনো সম্মান স্বীকৃতিও পাননি। ড. শুভ জোয়ারদার দেবল রায় সম্পর্কে নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন।-''অভিনেতা এবং একজন সৎ নাট্যকর্মী হিসাবে দেবলদার যা প্রাপ্য, তা এখনো তিনি পাননি। অভিনেতা হিসাবে ওঁর ক্ষমতা এখনও অনেকটাই অব্যবহৃত, হয়তো খানিকটা অবহেলিতও।''[১৬] অবহেলিত মানুষটি কিন্তু অল্পতেই সন্তুষ্ট ছিলেন।- ''নাট্যতীর্থের সদস্যদের অকৃত্রিম ভালোবাসা শ্রদ্ধায় আমি আপ্লুত। এরা আমাকে সভাপতির সম্মান দিয়েছেন। আমাকে সংস্থার 'মন্মথ মঞ্চে'র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করানোর মর্যাদা দিয়েছে। এ মর্যাদা বাংলার নাট্য ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সত্যিই আমি ধন্য''[১৭]। ২০০৯ সালের ২১শে অক্টোবর তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

প্রণব মুখার্জী (১৯৩৩-----)ঃ

প্রণব মুখার্জী (শ্যামাদা) উত্তরবঙ্গের সঙ্গীত জগতে দীর্ঘ কয়েকদশক ধরে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। অত্যন্ত সুকন্ঠের অধিকারী, সুলেখক এবং সুঅভিনেতা। তাঁর লেখা ও সুর দেওয়া বহুগান দক্ষিণ দিনাজপুরের সীমানা ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পরেছে। ১৯৩৩ সালে দক্ষিণ দিনাজপুরে জন্ম। পিতা কালিদাস মুখার্জী, মাতা সতীরাণী দেবী। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে স্নাতকোত্তর। প্রথমে খাদিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং পরবর্তীতে বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৭ সাল থেকে আকাশবানী শিলিগুড়ি কেন্দ্রে গান পরিবেশন করে চলেছেন। ১৯৭৫ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত শিলিগুড়ি এবং কলকাতা আকাশবাণীর স্বীকৃত গীতিকার। খেয়াল, আধুনিক, শ্যামাসংগীত, ভজন প্রভৃতি নিয়ে প্রায় ১৫০০টি গান রচনা করেছেন। এবং সুর দিয়েছেন। বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের সক্রিয় সদস্য, সদস্যপদ লাভ করেন ১৯৬২ সালে। নাট্যমন্দিরে তাঁর সমকালীন অভিনীত সমস্ত নাটকে গানে কন্ঠ দিয়েছেন। কন্ঠ সুর এবং অভিনয় প্রতিভা তাঁর সহজাত।

১৯৬২ সালের পূর্বে ফুড কর্পোরেশন থেকে 'পি.ডব্লু.ডি.' নাটকে অঞ্জলী চরিত্রে তাঁর প্রথম অভিনয়, পরিচালক ছিলেন ছানা গুহ, নাটকটি নাট্যমন্দির মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। ফুড কর্পোরেশনের প্রযোজনায় করেন 'রক্তকবরী' বিশু পাগলের ভূমিকায়। নাট্যমন্দিরের সভ্য থাকা কালীন তিনি ত্রিশূলের প্রযোজনায় 'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। নাট্যমন্দিরে তাঁর প্রথম নাটক 'গণশার বিয়ে' গণশার চরিত্রে। নাট্যমন্দিরে তাঁর অভিনীত নাটকগুলি হল-'নীলদর্পন'(দেওয়ান), 'নটীবিনোদিনী'(গিরিশ ঘোষ), 'গুলশন'(সরকার মশাই), 'লৌহকপাট'(দারোগা), 'গণদেবতা'(দেবু), 'সূর্যশিকার'(সমুদ্র গুপ্ত), কাবুলিওয়ালা' (কাবুলিওয়ালা), 'মধুসূদন' (মধুসূদন), 'আমার মাটি' (বাবা), 'সেই মেয়ে'(ডাক্তার), 'ফেরা', 'তাহার নামটি রঞ্জনা', 'উল্কা',(কমলেশ), 'বৃষ্টি বৃষ্টি', 'সীমান্তের ডাক', 'অরুণোদয়ের পথে', প্রভৃতি। বালুরঘাটের নাটকে তাঁর কণ্ঠের কতকগুলি গান স্মরণীয় হয়ে আছে।

১. নটীবিনোদিনীতে-'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই'।
২. ছেঁড়াতার এ - 'ফালি চান্দের নাও বাহি যায়রে'।
৩. সানাই এ - 'আমাদের এ মন একটা আকাশ দেও যেখানে মুক্তি লেখা আছে।'

খ্যাতনামা কণ্ঠ শিল্পি ও অভিনেতা প্রণব মুখোপাধ্যায় বহু সংবর্ধনা পেয়েছেন। স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শ্রীমুখোপাধ্যায় ২০১৪ সালে 'বঙ্গরত্ন' সম্মানে ভূষিত হন।

পুষ্প সমাজদার (১৯৩৬-২০০৭)ঃ

স্বামী সংসার সন্তান নিয়ে একজন গৃহবধু কি ভাবে একজন উদয়াস্ত অভিনেত্রী হয়ে উঠতে পারে পুষ্প সমাজদার তাঁর জলন্ত দৃষ্টান্ত। বালুরঘাটে ১৯৩৬ সালে জন্ম।পিতা সুরেন্দ্র মোহন দে।স্বামী প্রভাষ সমাজদার।তিনি স্কুল ফাইনাল পাশ, চাকরী করতেন।তাঁর পরিবারে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশ।তাই অভিনয় জগতে আসতে তাঁর কোনো সমস্যা হয়নি।তাঁর স্বামী প্রভাস সমাজদার দীর্ঘদীন বালুরঘাট নাট্য মন্দিরে অভিনয় করেছেন এবং তিনি তাঁর স্ত্রীকে নাটকে প্রেরণা জুগিয়েছেন।পুষ্প সমাজদার ১৯৬০ সালে 'শেষ রক্ষা' নাটক অভিনয়ের মধ্যদিয়ে নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করেন। বালুরঘাট নাট্য মন্দিরে তাঁর অভিনীত নাটক গুলি হল ১) শেষ রক্ষা ২) ফেরারী ফৌজ ৩) দুই মহল ৪) বৌদির বিয়ে ৫) চার প্রহর।১৯৬৯ সালে ত্রিতীর্থ গঠন কালে সমাজদার দম্পত্তির অবদান ছিল যথেষ্ট।

ত্রিতীর্থ অভিনীত নাটক গুলি হল- ১) পুতুল খেলা ২) এবং ইন্দ্রজীৎ ৩) অমৃতস্যপুত্রা ৪) শের আফগান ৫) রাজযোটক ৬) মঞ্জরী আমের মঞ্জরী ৭) দেবী গর্জন, ৮) কর্ণকুন্তী সংলাপ ৯) নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র ১০) ভাঙ্গাপট, ১১) শিশুপাল, (১২) বহুরূপী, (১৩) তিন বিজ্ঞানী, (১৪) বল্লভপুরের রূপকথা। 'বল্লভপুরের রূপকথা' তাঁর শেষ নাটক।

আনন্দমোহন তলাপাত্র (১৩৪৪-)ঃ

ভিক্ষু বলে পরিচিত। অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলার সৎগুণা গ্রামে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ১১ই চৈত্র জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা গোবিন্দ মোহন তলাপাত্র, মাতা লক্ষ্মীরাণী দেবী। তিনি পুথিগত বিদ্যা গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর লেখালেখির যশ ছিল। তাঁর লেখা 'ইঙ্গিত'(১৯৭৭) বোয়ালদাড় নাট্যসংস্থায় অভিনীত হয়েছে। তিনি বেশ কতকগুলি ছোট

গল্প ও কবিতা লিখছেন যে গুলি 'আত্রেয়ী','বরেন্দ্রভূমি'তে প্রকাশিত হয়েছে। শিশুবাস্থায় তিনি গ্রামের নাটক যাত্রাতে অভিনয় করেছেন। এর পর তিনি ১৯৫৬ সালে বোয়ালদাড়ে 'সিন্ধুগৌরব' নাটকে প্রথম অভিনয় করেন। যে কোনো চরিত্রেই তিনি অনায়াসে রূপদান করতে পারতেন। তবে কমিক চরিত্রে তিনি অসাধারণ অভিনয় করতেন। বোয়ালদাড় নাট্যসংস্থার সমস্ত নাটকেই তিনি অভিনয় করেছেন কিন্তু বয়সের ভারে স্মৃতিভ্রষ্ট তাই চরিত্রে নাম বলতে পারলেন না।

সরোজ সাহা (১৯৩৭--)ঃ

পূর্ব বঙ্গের ময়মনসিংহ জেলায় ৩১.১২.১৯৩৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা প্রাণগোপাল সাহা। মাতা স্নেহলতা দেবী। ময়মনসিংহ শিবগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে চতুর্থ শ্রেণী, টাঙ্গাইলের রামকৃষ্ণমিশনে পঞ্চম শ্রেণী পাশ করেন। ১৯৪৮ সালে সপরিবারে বালুরঘাটে চলে আসেন এবং বালুরঘাট হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে বালুরঘাট হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। ISC বালুরঘাট কলেজে পড়েছেন। ১৯৫৮ সালে বালুরঘাট DI অফিসে LDC পদে কর্মজীবন শুরু করেন। অবসর নিয়েছেন ১৯৯৫ সালে। পূর্ববঙ্গে থাকাকালীন তাঁর বাবা গানবাজনা ও নাটক করতেন। পারিবারিক সাংস্কৃতিক আবহাওয়া থেকেই তিনি নাটকে অনুপ্রাণিত হয়। ১৯৬৭ সালে নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করেন। ১৯৮৯-৯১ এর নাট্যমন্দিরের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে নাট্যমন্দিরের কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় ডাকবাংলো পাড়ায় ছেলেদের সঙ্গে মঞ্চ বেধে তাঁর প্রথম অভিনীত নাটক 'বিজয়সিংহ'। এছাড়াও পাড়ার মঞ্চে করেছেন 'বঙ্গে বর্গী', 'কালোঘোড়া' প্রভৃতি নাটক। নাট্যমন্দিরে তাঁর প্রথম নাটক 'ছেঁড়াতার'(১৯৬৯)। নাট্যমন্দিরে তিনি করেছেন-'শয়তানশ্রী', 'সমুদ্রসন্ধানে', 'সকালের জন্য', 'যৌবন', 'মারিচ সংবাদ', 'নটীবিনোদিনী', 'নীলদর্পন', 'পথেরদাবী' প্রভৃতি।

সুনীল খাঁ (১৯৩৭-২০১০):-

বহুগুণের অধিকারী ছিলেন সুনীল খাঁ। স্বচ্ছল পরিবারে, জমিদারী সুলভ জীবন যাপনে অভ্যস্ত সুনীল খাঁ স্বভাবে ছিলেন কবি। ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিধান সরণিতে জন্ম। পিতা সুধীন্দ্র নাথ খাঁ (পালা খাঁ) ছিলেন অভিনেতা। তিনি বালুরঘাটে যাত্রা নাটক করতেন। সুনীল খাঁ ১৯৫৭ সালে স্কুল ফাইনাল পাস করেন। আই. এ. ১৯৫৯ সালে, বি. এ পাশ করেন ১৯৬২ সালে। পড়াশোনা চলা কালীন তাঁর চলে ছবি আঁকা, ফটো তোলা, কবিতা লেখা। কবি সুনীল খাঁ সৃজন শীল নানা গুণের জন্য ছাত্রদের খুব প্রিয় ছিলেন। ছাত্র জীবনেই শোষণহীন সমাজ গঠনের মার্কস বাদী চিন্তায় উদ্বেলিত হয়ে নানা রকম লড়াই সংগ্রামে নিজেকে স্বার্থহীন ভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। ১৯৫৮ সালে কলেজে সোস্যাল ফাংশানে 'রীতিমতো নাটক' - এ প্রথম দ্বিগম্বর মজুমদারের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেন। ১৯৭৮ সালে নাট্যমন্দিরে যোগদেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক গুলি হল - 'সীতা', ভাওয়ালের রাজা', 'টিপু সুলতান', 'সিংহাসন', 'ঝড়ের খেয়া' 'কাবুলিওয়ালা' প্রভৃতি। 'নাট্যতীর্থ' নাটসংস্থায় 'ড: ফস্টাস' (ড: ফস্টাস), 'য্যায়সা কা ত্যায়সা' (ড: নন্দী), 'মহাযুদ্ধ' (যুধিষ্ঠির) অভিনয় করেছেন। নাট্যতীথের প্রযোজনায় 'ড: ফস্টাস' নাটকে ড: ফস্টাস চরিত্রে অভিনয়ে ১৯৯১ সালে দিশারী পুরস্কার পান। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ একজন সৎ নাট্যকর্মী হিসাবে নিজের দায়িত্ব

পালন করেছেন। তিনি শেষ জীবনে নাট্য জগত থেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। ২০১০ সালের ১৬ই জুলাই শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

জীবনকানাই মুখোপাধ্যায় (১৯৩৮ -)ঃ

অভিনেতা, পরিচালক, নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের জ্যেঠতুত দাদা জীবন কানাই মুখোপাধ্যায়। জীবন কানাই মুখোপাধ্যায় কুমারগঞ্জ থানার বটুনে ১৯৩৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সচীকান্ত মুখোপাধ্যায়, মাতা কণক প্রভা দেবী। পতিরাম প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে। এবং পতিরাম হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেন। কলেজে পড়াশোনাকালীন তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে তিনি বালুরঘাটে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ব্লক স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তিনি তপন ব্লকে যান। ১৯৯৬ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পারিবারিক ভাবেই তিনি নাট্য প্রতিভা পেয়েছিলেন। ১১-১২ বছর বয়সেই তিনি পতিরামে বেশ কতক গুলি যাত্রা পালায় অভিনয় করেছেন। তরুণতীর্থের প্রায় সমস্ত নাটক তিনি অভিনয় করেছেন। 'ত্রিতীর্থ' নাট্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও আজীবন সদস্য। চাকরি সূত্রে মুর্শিদাবাদ জেলায় থাকার কয়েক বছর বাদ দিয়ে তিনি ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক 'তরুণতীর্থ' নাট্য সংস্থায় করেছেন- 'বিজ্ঞাপন', 'ছেঁড়াকাগজের ঝুড়ি', 'বৈকুন্ঠের খাতা' প্রভৃতি। ত্রিতীর্থে মোট ৮-১০টি নাটকে অভিনয় করেছেন - ''শিশু পাল', 'পরবাস', 'মন্ত্রশক্তি' (বদনমাঝি), 'জল' (উচ্চবর্ণ হিন্দু), 'দেবাংশী' (সেতু বর্মন), 'দেবীগর্জন' (সর্দার), 'তিন বিজ্ঞানী', 'গ্যালিলিও' (দার্শনিক), 'তুঘলক' (গিয়াসুদ্দিন)। 'দেবাংশী' কলকাতাতে অভিনয়ের সময় তাঁর সেতু বর্মনের অভিনয় দেখে অরুণ মুখার্জী প্রশংসা করেছিলেন। তিনি কলকাতা, শিলিগুড়ি, বনগাঁই গাঁ, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ সংস্থার হয়ে অভিনয় করতে গিয়েছেন।

তিনি স্বীকার করেন এবং দর্শকের দৃষ্টিতে তাঁর শ্রেষ্ঠ অভিনয় হল 'দেবাংশী' নাটকে সেতু বর্মনের অভিনয়। তিনি বলেন, অভিনয় আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের বিষয়।

অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামী (১৯৩৮-২০০১)ঃ

বালুরঘাটের সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে যাদের নাম ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক অচিন্ত্য কৃষ্ণ গোস্বামী অন্যতম। ১৯৩৮ সালের ২৪শে নভেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের নেত্রকোন-এ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মধুসূদন গোস্বামী। ভারত ভাগ হবার পর তিনি নবদ্বীপে চলে আসেন। নবদ্বীপের বকুলতলা হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করে সেখানকার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করেন। কলকাতায় আশুতোষ কলেজ থেকে স্নাতক হন সংস্কৃত বিষয়ে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষালাভের সময় থেকেই তিনি তাঁর প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে আগ্রহ জন্মে। ১৯৬১ সালে তিনি বালুরঘাট কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। অচিন্ত্য কৃষ্ণ গোস্বামীর সাংগঠনিক প্রতিভা ছিল প্রবল। বালুরঘাট কলেজ সংগ্রহশালা, বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয় রবীন্দ্রভবন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের ক্ষেত্রে অচিন্ত্য গোস্বামীর ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বড় মাপের অভিনেতা ছিলেন না বটে কিন্তু কি ভাবে নাট্যমন্দিরকে আধুনিক মাত্রায় নিয়ে যাওয়া যায় তার চেষ্টা করেছেন। ১৯৬৯ সালে নাট্যমন্দিরে যোগদান করেন। ১৯৭১-

১৯৭৭ সাল পর্যন্ত নাট্যমন্দিরের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এই সময়ে নাট্যমন্দিরের গতানুগতিক রীতিবর্জন করে নতুন রীতি নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সামিল হয়। বিশেষ করে আলোক সম্পাদ, আবহসঙ্গীত, শব্দানুষঙ্গ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টার সাক্ষী হয় বালুরঘাট নাট্যমন্দির। তিনি কোনো কোনো নাটকের নির্দেশনা দিয়েছেন শোনা যায় কিন্তু নাম জানতে পারিনি। তিনি অভিনয় করেছেন 'ছেঁড়াতার'(মহিম), 'নটিবিনোদিনী' (সূত্রধর) নাটকে। তাঁরই উদ্যোগে নাট্যমন্দির সাতের দশকে লক্ষ্মৌ, এলাহাবাদ, পাটনাতে নাটক প্রযোজনা করেছেন। ২০০১ সালে ৩রা অক্টোবর তিনি পরলোক গমন করেন।

মানিক লাহিড়ী (১৯৩৯-২০১৩)ঃ

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের সাধারণ সম্পাদক (১৯৮৬-৮৯) বিশিষ্ট নট ও নাট্য সংগঠক ছিলেন। তিনি কৈশোর থেকে বালুরঘাট শহরের নাট্য আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নাট্য সংগঠক হিসেবে বালুরঘাট শহরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। পাঁচ ও ছয়ের দশকে বেলতলা পার্ক এলাকায় খোলামঞ্চের নাটকে নিয়মিত অভিনয় করতেন এবং সেখানে নাটক পরিচালনাও করতেন। ১৩৪৬ সালের ১৭ই চৈত্র ত্রিপুরার সোনামুখ গ্রামে মামা বাড়িতে জন্ম। পিতা সুধীর লাহিড়ী ও মাতা লীলাবতী দেবী। তারপর তাঁদের আদি বাড়ি রাজশাহীতে যান। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর এবং বাবার মৃত্যুর পরে কলকাতার হাওড়াতে 'কেদারনাথ ইউনস্টিটে' নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখান থেকে প্রবেশিকা ১৯৬৬ সালে। ইতিহাস এবং ইংরেজীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরিশ্রমী প্রবল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বামপন্থীর সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। তিনি নাট্যমন্দিরের সদস্য লাভ করেন ১৯৬৭ সালে। নাট্যমন্দিরে তাঁর অভিনীত নাটক গুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য-'গণদেবতা', 'ছেঁড়াতার', 'নয়ন কবিরের পালা', 'নীলদর্পন', 'মারীচসংবাদ', রাজদর্শন', 'বাঘিনী', 'গুলশান'। তিনি অঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। তাই অভিনয় ছাড়াও তিনি মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চ পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্ব পূর্ণভূমিকা পালন করেন। তিনি সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন নাট্যমন্দির 'বাঘিনী' নাটকের জন্য দিশারী পুরস্কার লাভ করেন। নিজস্ব ক্ষমতা ও কলাকুশলতার গুণে তিনি বালুরঘাটের নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। ০৪.০৮.২০১৩ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ভূদেব দত্ত (১৯৪০-২০০৭)ঃ

ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার অভিনেতা ভূদেব দত্ত ১৯৪০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা উপেন্দ্র নাথ দত্ত, মাতা আশালতা দেবী। স্নাতক ভূদেব দত্ত বালুরঘাটে জর্জকোর্টে চাকুরী করতেন। ত্রিতীর্থ ছাড়া তিনি অন্য কোথাও অভিনয় করেননি। 'দেবাংশী'(গ্রামবাসী), 'ঠাকুরদা'(ভূপতি, 'জল', 'তুঘলক', চিরকুমারসভা', 'বিছন' (দারোগা) প্রভৃতি নাটকে অসাধারণ অভিনয় করেছেন।

পুলক সেনগুপ্ত (১৯৪২---)ঃ

সুকণ্ঠের অধিকারী কলকাতার ঢাকুরিয়াতে ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী জন্ম। পিতা অমলেন্দু সেনগুপ্ত। বি.কম পাশ। চাকুরী সূত্রে বালুরঘাটে এসে ১৯৭০ সালে ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন। নাটকে গান থাকলেই তিনি কণ্ঠ দিয়েছেন। ত্রিতীর্থে তাঁর প্রথম

নাটক 'ছুটির খেলা'। তারপর 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'শিশুপাল', 'জল', তুঘলক' 'গ্যালিলেও', 'দেবীগর্জন' ইত্যাদি নাটকে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

নীলা কর (১৯৪২--)ঃ

অবিভক্ত দিনাজপুর ও বালুরঘাটের অবিস্মরণীয় অভিনেতা শিবপ্রসাদ করের কন্যা নীলাকর ও শিলাকর দুই বোনই বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের কণ্ঠ শিল্পী ছিলেন। মাতা নীরদবালা কর। দক্ষিণ দিনাজপুরের বাহিচা গ্রামে দুই বোনেরই জন্ম। নীলাকর কয়েকটি নাটকে অভিনয় করেছেন। তবে কণ্ঠশিল্পী হিসেবেই তাঁরা পরিচিত।

অধির কুমার সরকার (১৯৪২--)ঃ অধির সরকার ডাক নাম দুখু। শৈশব থেকেই তিনি পিতৃমাতৃহারা। ১৯৪২ সালের ৫ই এপ্রিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বোয়ালদাড় গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সুধীর সরকার, মাতা প্রভাবতী দেবী বোয়ালদাড় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তাঁর পাঠ গ্রহণ শুরু। খাদিমপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করেন। প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। দশ বছর বয়স থেকেই তিনি ছোট ছোট অভিনয় করতেন। বোয়ালদাড় নাট্য সংস্থায় তিনি প্রবেশ করেন ১৯৫৬ সালে। সেখানে তিনি প্রথম অভিনয় করেন 'সিন্ধুগৌরব' নাটকে। এরপর তিনি একের পর এক নাটকে অভিনয় করলেন- 'শেষনমাজ' (নবাব দাউদখা), 'রাজবন্দী'(রাজবন্দী), 'কাকন তলার মেয়ে'(কাশিনাথ), 'মন্দিরে আজান'(বান্দা), 'বন্দীর ছেলে'(বন্দী), 'সিরাজদৌল্লা' (সিরাজ), 'তাসের ঘর' (ধুমকেতু, সুধাকর)। এছাড়াও করেছেন 'অভিযান', 'মল্লাদের দরবার', 'দেনাপাওনা', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'কেদার রায়', 'সাজাহান', 'চন্ডীতলার মন্দির', 'শতাব্দীর পাপ', 'লৌহকপাট', 'কে দেবে কবর'। 'সৌখিন' নাট্যসংস্থা'র হয়ে নাট্যমন্দিরে 'আনন্দমঠ' করেন। বোয়ালদাড় সংস্থা ছাড়াও একক ভাবে এই জেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিনয় করেছেন। এখন ৮২ বছরের বয়স্ক অভিনেতা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন।

বীথিকা মুখার্জী (১৯৪২--)ঃ

নাট্যমন্দিরের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী বীথিকা মুখার্জী দক্ষিণ দিনাজপুরের বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী প্রণব মুখার্জীর স্ত্রী। ১৯৪২, ৩রা মে তাঁর জন্ম। পিতা সুশীল কুমার চক্রবর্তী, মাতা অনিমা দেবী। জলপাইগুড়ি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ। বালুরঘাট কলেজ থেকে স্নাতক। তাঁর প্রথম নাটক 'অঙ্গনা যুগে যুগে', পরিচালক ছিলেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। রিজিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। নাট্যমন্দিরে বেশকতকগুলি অভিনয় করেছেন কিন্তু নাটকের নাম স্মরণে আনতে পারেনি। 'গণদেবতা'(বিলু), 'বিন্দুর ছেলে'(বড়জা) - প্রভৃতি নাটকে সার্থক অভিনয় করেছেন। অভিনয় ছাড়াও তিনি সঙ্গীত জগতের সঙ্গে জড়িত আছেন।

চিত্তরঞ্জন মহন্ত (১৯৪২---)ঃ

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের একনিষ্ঠ সেবক, নাট্যকর্মী, সংগঠক ও অভিনেতা চিত্তরঞ্জন মহন্ত। ১৯৪২ সালে বালুরঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা বিনোদ বিহারী মহন্ত, মাতা কুসুম কুমারী দেবী। বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক। কলকাতার সুরেন্দ্র নাথ

কলেজ থেকে বি.কম. করে বালুরঘাট ডি. এম. অফিসে ক্ল্যারিক্যাল পোষ্টে কর্মজীবন শুরু করেন। ২০০৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৯১-১৯৯৭ পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি নাট্যমন্দিরকে অক্লান্ত ভাবে সেবা করেছেন। তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল অপরিসীম। তাঁর সময়কালে নাট্যমন্দির অগ্রগতি লাভ করতে পেরেছেন। 'ছেঁড়াতার', 'গণদেবতা', 'রাজদর্শন', 'নীলদর্পন' প্রভৃতি নাটকে সফল অভিনয় করেছেন।

প্রণব চক্রবর্তী (১৯৪২)ঃ

১৯৪২ সালে অধুনা বাংলা দেশের সান্তাহারে জন্ম গ্রহণ করেন, পিতা মদন মোহন চক্রবর্তী। এপার বাংলায় এসে তিনি বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং এখানে থেকেই তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে স্নাতক এবং ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি M.A. পাশ করার পর দেড় বছর বিদ্যালয়ে চাকরী করেন। তারপর ১৯৬৯ সালে তিনি বালুরঘাট কলেজে স্থায়ী পদে নিযুক্ত হন। তিনি মনে করেন ''জন্মভূমি ছেড়ে আসলেও, তাঁর প্রচুর ক্ষতি হলেও তিনি এখানে (বালুরঘাট) এসেই লাভবান হয়েছেন। শিক্ষা, দীক্ষা, মনের আনন্দ, স্বাচ্ছন্দ সবই তিনি পেয়েছেন অনেক বেশী। তাঁর বাবা খুব ভালো গান করতেন। সেই সূত্রে তিনি কণ্ঠে সুর পেয়েছেন। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গান গেয়েছেন প্রচুর।

১৯৬৯ সালে তিনি নাট্যমন্দিরে যোগদান করেন। নাট্যমন্দিরের সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন তিনি। ১৯৭৮-১৯৮০ পর্যন্ত তাঁর প্রথম অভিনয় 'ছেঁড়াতার' নাটক। নাট্যমন্দিরে তিনি অভিনয় করেছেন - 'তাহার নামটি রঞ্জনা', 'ছেঁড়াতার', 'ঝুমুর', 'নীলদর্পন', 'দানসাগর', 'সাজানো বাগান', 'মারীচ সংবাদ', 'সূর্য শিক্ষার', 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণ মন্ডলের ঘর গেরস্তি' তাঁর প্রথম পরিচালিত নাটক হল 'সকালের জন্য'। নাট্যমন্দিরে তাঁর পরিচালিত নাটক - 'বিশ পঞ্চাশ,' 'বৃষ্টি বৃষ্টি', 'ঈশ্বরবাবু আসছেন', 'শয়তান শ্রী'।

১৯৮২ সালে প্রায় ২৫-৩০ জন সদস্য নিয়ে তিনি নাট্যমন্দির থেকে বেড়িয়ে আসেন এবং গড়ে তোলেন 'নাট্যতীর্থ' নাট্যসংস্থা। এখানে তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। নাট্যতীর্থে তিনি খুব বেশি নাটকে অভিনয় করেননি। 'মহাযুদ্ধ' (শাজাহান), 'ড: ফস্টাস' (পোপ) কিন্তু প্রায় প্রতিটি নাটকেই তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। তিনি হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের 'খারিচ' নাটকটি পরিচালনা করেন ওয়ার্কশপ ভিত্তিক। 'খারিচ' নাটক পরিচালনা অন্যদের দিয়ে করিয়েছেন। তিনি মনে করেন ''কয়েক জন মিলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নাটক পরিচালন করলে সংস্থা কোনো দিন ডিরেক্টর বিহীন হয়ে পড়বে না।''[১৮] তিনি একটা স্থায়ী মঞ্চ স্থাপনের কথা ভাবতেন। ড. মন্মথ রায় বালুরঘাটের মানুষ তাঁকে যদি কোনো স্মৃতি চিহ্নের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা যায় তবে একটা বড় কাজ হবে বলে তিনি মনে করতেন। তিনি সম্পাদক থাকাকালীন বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে চেয়ে সরকারী সাহায্য নিয়ে, বিশ্বনাথ চৌধুরী তখন M.L.A., তাঁর কাছ থেকে সরকারী সাহায্য নিয়ে পৌরসভার নিকট শীততাপ নিয়ন্ত্রিত একটি মঞ্চ স্থাপন করেন। মঞ্চটি ড. মন্মথ রায়ের নামে উৎসর্গ করা হয়। নাট্যতীর্থের মঞ্চ তৈরীর পর তিনি নাট্যতীর্থের সম্পাদক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

সমর সরকার (১৯৪৩---)ঃ

বালুরঘাট নাট্যমন্দির গতপ্রাণ সমর সরকার ০২.০৭.১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলাদেশের ভুটিয়া পাড়ায় (জয়পুর হাট থানা, জেলা বগুড়া) জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা জীবনকৃষ্ণ সরকার জোতদার ছিলেন। মাতা সুভাষিনী দেবী। দক্ষিণ দিনাজপুরের চিঙ্গিশপুরে জীবনকৃষ্ণ সরকারের খামার বাড়ি ছিল। ১৯৫০ সালে শান্তাহারের যুদ্ধের সময় তারা খামার বাড়িতে আসেন। বাংলাদেশ থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে ভারতে এসে বালুরঘাট ললিত মোহন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই ১৯৫৯ সালে স্কুল ফাইনাল পাশ করেন। ইন্টারমিডিয়েট পড়তে পড়তে তিনি মালদা পলিটেকনিক কলেজ থেকে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার হন। নয়-দশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম নাটক-'তারিণী সেন বধ' নাটক। পাড়াতে করেন 'বিশ বছর আগে', 'মনপেথি', 'মুকুট'। ১৯৬৯ সালে নাট্যমন্দিরের সদস্য হন। নাট্যমন্দিরে তিনি খুব বেশী অভিনয় করেননি। যেহেতু তিনি ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিযার, বালুরঘাটে তেমন লাইটম্যান ছিল না তখন তিনি নাটকে লাইটের কাজ শুরু করলেন। এই সময় কালে কালিয়াচক থেকে আসেন লাইটম্যান পুরুষোত্তম সোমানী। পুরুষোত্তম সোমানীর কাছে তিনি লাইট বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯৬৯ এর পর নাট্যমন্দিরের প্রায় সমস্ত নাটকেই তিনি লাইট দিয়েছেন। ২০০১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত নাট্যমন্দিরের সম্পাদক ছিলেন। তিনি বলেন-''নাট্যমন্দির আমার কাছে একটা মন্দিরের মত''[১৯]। দীর্ঘদিন নাট্যমন্দিরের সঙ্গ যুক্ত ছিলেন। নাট্যমন্দির ভেঙ্গে আরো কয়েকটি নাট্যসংস্থা গড়ে উঠলেও তিনি অনুরাগ বসত অন্য কোনো সংস্থায় নাটক দেখেননি। এতোটাই তিনি নাট্যমন্দিরকে ভালো বাসতেন।

রেবা ব্যানার্জী (১৯৪৩---)ঃ বালুরঘাটের নাট্যজগতে সারা জাগান অভিনেত্রী রেবা ব্যানার্জী। ১৯৪৩ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর বালুরঘাটে জন্ম। পিতা দেবেন্দ্র নাথ দত্ত গুপ্ত মাতা চারুবালা দেবী। বালুরঘাট গালর্স হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ। বালুরঘাট কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। স্কুল শিক্ষিকা হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। প্রথমে কালিয়াগঞ্জ সরলা সুন্দরী হাইস্কুলে (১৯৬৬) সেখান থেকে খাদিমপুর গালর্স হাইস্কুলে আসেন ১৯৭১ সালে এবং এখান থেকেই ২০০৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি শৈশব থেকেই অভিনয় পছন্দ করতেন। পরিবারেই ছিল নাট্য অভিনয়ের আবহাওয়া। বালুরঘাটে পাড়ায় পাড়ায় অস্থায়ী মঞ্চে নাটক করার প্রচলন ছিল। রেবা ব্যানার্জীর প্রথম অভিনয় পাড়ার অস্থায়ী মঞ্চে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ১১-১২ বছর বয়সে। পাড়ার অস্থায়ী মঞ্চে তিনি বেশ কয়েকটি নাটকে অভিনয় করেন। যেমন- 'নিমাই সন্ন্যাস', 'মুক্তির ডাক'। কচিকলা একাডেমীতে 'জুতোর জয়' প্রভৃতি। তিনি যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়েন বালুরঘাট বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'ডাকঘর' নাটকে অমল চরিত্রে অভিনয়ের জন্য গোল্ড মেডেল পান। এরপর থেকে তাঁর অভিনয় প্রতিভা সকলের নজরে আসে। 'তরুণতীর্থ' নাট্য সংস্থায় নাটককার পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'নাট্যাকরের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র', 'পাখির বাসা' নাটকে অভিনয় করেছেন।

নাট্যমন্দিরে তিনি অভিনয় করেছেন-'ফেরা'(সর্ব্বরী), 'তাহার নামটি রঞ্জনা' (রঞ্জনা), 'পথেরদাবী' (সুমিত্রা, ভারতী) প্রভৃতি নাটকে। তিনি নাট্য মন্দিরের নির্দেশ মেনে দীর্ঘ ১৮ বছর কোনো সংস্থায় অভিনয় করেননি। এমনকি নাট্যমন্দিরেও অভিনয় করেননি। ১৯৯১ সালে তিনি ত্রিতীর্থে যোগদান করেন এবং ১৯৯৩ সালে তিনি ত্রিতীর্থে তাঁর প্রথম

নাটক 'মঞ্জরী আমের মঞ্জুরী' (জমিদার গিন্নি)। ত্রিতীর্থে তিনি বহু নাটকে অভিনয় করেছেন- 'পণন'(মা), 'তিন বিজ্ঞানী'(মিসেস রোজ), 'দেবাংশী'(প্রতিবেশী), 'মাতৃতান্ত্রিক'(রমা), 'করকুহক'। ২০০৮ সালের পরেও তিনি বহু অভিনয় করেছেন। তিনি রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে অভিনয় করেছেন। কলকাতার 'রবীন্দ্রসদনে', মধুসূদন মঞ্চে 'একাডেমী'তে অভিনয় করেছেন। ২০০০ সালে দিল্লিতে দু'টি নাটকের (মাতৃতান্ত্রিক, পণন) এ অভিনয় করেছেন। সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়েই তিনি অভিনয় করেছেন। তিনি স্বীকার করেন যে 'মাতৃতান্ত্রিক' নাটকে মায়ের অভিনয় তাঁর শ্রেষ্ট অভিনয়। তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন। নাট্যমন্দিরের অভিনয় কালে 'লোকরঙ্গ হাওড়া আয়োজিত সারা বাংলা শিশির একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা'য় (১৯৬৯) 'তাহার নামটি রঞ্জনা' নাটকে রঞ্জনার ভূমিকায় তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী এবং লক্ষ্মৌ বেঙ্গলী ক্লাব আয়োজিত। 'সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতা'য় (১৯৭০), 'ফেরা' নাটকে সর্ব্বরী চরিত্র অভিনয়ে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান। গায়ক ও অভিনেতা প্রণব মুখোপাধ্যায় রেবা ব্যানার্জীর অভিনয় সম্পর্কে বলেন-''মেক-আপ হয়ে গেলে রেবা একবারে ভিন্ন চরিত্র ধারণ করত। চুপচাপ বসে নিজের পার্টটা আওড়াত। রেবা ব্যানার্জীর মত শক্তিময়ী অভিনেত্রী আমি স্টেজে দেখি নাই''[২০]। 'তাহার নামটি রঞ্জনা' নাটকে রেবার রঞ্জনার ভূমিকায় অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছেন-''আমি দেখেছি রেবার এই দৃশ্য করে স্টেজের বাইরে এসে কী অঝোরে ঝরে কান্না। একী ভোলা যায়? শিল্প সৃষ্টি কাকে বলে সেদিন দেখেছিলাম।''[২১] 'মাতৃতান্ত্রিক' নাটকের বিষয় উল্লেখ করে রেবা ব্যানার্জী তাঁর জীবনের একটি আক্ষেপ বা ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যা একজন শিল্পীর ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। ''পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে গেলে মানুষকে জন্ম থেকে জন্মান্তরে ভ্রমন করতে হয়। আমি যদি, সত্যি আমার যদি জন্মান্তর বলতে কিছু থেকে থাকে তাহলে আমি যেন পরবর্তী জন্মে নাটককে ভালোবেসেই জন্মায়। আর এরকম (হরিমাধব মুখোপাধ্যায়) একজন নাট্যগুরুর কাছেই শিক্ষা লাভ করতে পারি।''[২২]

কমল কান্তি সমাজদার (১৯৪৪---)ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের সঈদপুর গ্রামে ১৮ই জানুয়ারী ১৯৪৪ সালে জন্ম। খাসপুর হরেকৃষ্ণ উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক এবং স্কুল ফাইনাল পাশ করেন। কর্মজীবনে তিনি পঞ্চায়েতের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। রাজনীতি ও যাত্রা থিয়েটার নিয়েই তাঁর সময় কাটতো। বাবা, ভাই অভিনয় করতেন (যাত্রা) সেই সূত্রে তিনি ছোট থেকেই অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতেন। ১৯৬০ সালে 'সাতভাই চম্পাতে' তাঁর প্রথম অভিনয়। নায়কের ভূমিকা ছিল তাঁর। নাটকটি খাসপুর মদনমোহন নাট্যসমাজের প্রযোজনায় মঞ্চায়িত হয়েছিল। এরপর তিনি বোয়ালদাড় নাট্যসংস্থাতে করেন 'রাজবন্দী', 'সাতভাই চম্পা', 'শেষ নমাজ', 'জল্লাদের দরবার'। তিনি পরিচালক হিসেবেই খ্যাত হয়েছেন। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', 'ঠাকুরশ্রীরামকৃষ্ণ','রাধার নিয়তি' নাটক গুলির নির্দেশক তিনি। সবগুলি নাটক খাসপুরে মঞ্চস্থ হয়।

সতেন্দ্র প্রসাদ দাস (১৩৩৭--)ঃ

নারু দাস বলে পরিচিত সত্যেন্দ্র প্রসাদ দাস ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে ১৭ই ভাদ্র জন্ম। পিতা গোবিন্দ দাস, মাতা আশালতা দেবী। বালুরঘাট হাইস্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে নদীপার এন.সি. স্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেন ১৯৬৮/৬৯ সালে। 'তূণীর'

নাট্যসংস্থায় সুজিৎ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় ১৯৭৩ সালে 'ছুটি ফাঁদে' তাঁর প্রথম নাটক। তূণীরে তিনি করেন 'দেওয়ালে পিঠ রেখে'(বিপ্লবী যুবক), 'অগ্নিগর্ভে হেকেমপুর ও পরাণ মন্ডলের ঘর গেরস্তী' (মুকুন্দ সর্দার)। নাট্যমন্দিরে তাঁর অভিনীত নাটক 'বাঘিনী'(বেদো), 'দর্পণসাক্ষী' (জগন্নাথ), 'প্রদোষে প্রভাত'(ওঝা), 'শাস্তি'(রামলোচন), 'মারিচ সংবাদ'(কালনেমী), 'কেউ কথা রাখে না' (হরিহর)।

আশিষ রায় (১৯৪৪---)ঃ

আশিষ রায় পিতা অনিল চন্দ্র রায়, মাতা প্রভাবতী দেবী, জন্ম ১৯৪৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর। প্রাথমিক থেকে বালুরঘাট হাইস্কুল। বি.কম. কলকাতার সুরেন্দ্র নাথ কলেজ থেকে এম.কম. বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭ সালে বালুরঘাট উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং এখানে থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা নাট্যমন্দিরের সদস্য ছিলেন এবং অভিনয়ও করতেন। সেই সূত্রেই তিনি অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর প্রথম নাটক অভিনয় অস্থায়ী মঞ্চে 'পুনর্জন্ম'। নাট্যমন্দিরে প্রবেশের পূর্বেই তিনি বহু অভিনয় করেছেন-

পাড়ায় (জয়হিন্দ মাঠ)	-'সিরাজের স্বপ্ন' (গ্রামবাসী, মাঝি), 'বিদ্রোহী'(ভিক্ষুক), 'জ্যান্ত ভগবান'(পিত্তন)
তরুণতীর্থ	- পূনর্জন্ম (ছেলে)
ডাকবাংলো মাঠ	-'উৎসব (নাকা), ' একলব্য'(বন্ধু), 'মহারাজা', 'সিরাজদৌল্লা'(নন্দকুমার)
অভিযাত্রী ক্লাব	- 'প্রাইভেট এপ্লয়মেন্ট এক্‌চেঞ্জ'(বড়বাবু), 'ত্রিরত্ন' (দোকানের মালিক), 'ষড়যন্ত্র'(কাকা),'জীবন যৌবন' (পাগলা উকিল)
বি.টি. কলেজ	- 'সমুদ্র সন্ধানে'(মহাজন), এখানে তিনি পরিচালনা করেন 'শিবকাবাব' নাটক।

নাট্যমন্দিরে প্রবেশ ১৯৫৭ সাল। এখানে তাঁর প্রথম নাটক 'গৃহপ্রবেশ'। নাট্যমন্দিরে তিনি বহু নাটকে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। 'অন্যছায়া'(লালমোহন), 'ঝুমুর',(বিহারী), 'নীলদর্পন'(লাঠিয়াল), 'নিকটে ফাঁদ' (জয়কালিবাবু), 'নটীবিনোদিনী' (সতু, প্রতাপ চাঁদ), 'ছেঁড়াতার'(ক্যাটকাটি ডাক্তার), 'পথের দাবি'(বোবা), 'মারীচ সংবাদ'(নায়েব), 'অগ্নিগর্ভে হেকেমপুর ও পরাণ মন্ডলের ঘর গেরস্তি' (হারাধন), নাট্যমন্দিরে তিনি মোট ৩০টি নাটকে অভিনয় করেন। 'দানসাগর' এ তিনি করেছিলেন মেধো চরিত্রে। প্রেম চাঁদের বিখ্যাত গল্প 'কফন' অবলম্বনে রচিত বাঙলা নাটক 'দানসাগর' নাট্যমন্দির কর্ত্তৃক অভিনীত হয়। মূল দুই চরিত্র ঘিষু ও মেধোর ভূমিকায় শ্রীশ্যামা তলাপাত্র, এবং শ্রী আশিষ রায় প্রশংসনীয় অভিনয় করেন। ১৯৮২ সালের ১৭ই অক্টোবর 'নাট্যতীর্থ' প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি। নাট্যতীর্থের প্রায় সমস্ত নাটকেই অভিনয় করেছেন।

পরিতোষ দাসঃ (১৯৪৪--)ঃ

পরিতোষ দাস ছিলেন অসাধারণ এক নাট্য উদ্যোগী, কুশলীনট, নাটকের বহু মাত্রিক কর্মকান্ডে অপরিহার্য কাজের মানুষ। নাট্যদলের নাটক চয়ন, মঞ্চ নির্মাণ, মহলা মঞ্চের আয়োজন অন্যদিকে শিল্পীর তত্ত্ববোধান, আপ্যায়ণ এবং নিজস্ব চরিত্র চিরত্রায়নে সমান

ভাবে নিয়মানুবর্তিতার উজ্জল প্রতীক ছিলেন পরিতোষ দাস। ১৯৪৪ সালে ৯ই আগষ্ট বালুরঘাটে জন্ম। আদর্শ ললিত মোহন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। অভিযাত্রী স্কুল ও অভিযাত্রী ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তাঁর সময়ে সুবর্ণতট, কলকাতায় বালুরঘাট ভবন, সত্যজিৎ মঞ্চ, R.S.P পার্টি অফিস তৈরি হয়েছে। মার্কসবাদী নাট্যব্যক্তিত্ব নাটকের মাধ্যমেই আন্দোলন করে গেছেন। খেলার জগতে ও তিনি ভালো ছিলেন। ভালো রেফারী ছিলেন। DSA এর সেক্রেটারী ছিলেন। এবং IFA এর Life Member ছিলেন। পিতা ভোলানাথ দাস, ১৯৭৮ সালে ১১ই মার্চ সাবিত্রী দাসের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি নাট্যমন্দিরে ১৯৬৯-১৯৮০ সাল পর্যন্ত অভিনয় করেছেন-'লৌহকপাট', 'ঈশ্বরবাবু আসছেন', 'সকালের জন্য', 'ঝুমুর', 'নীলদর্পণ', 'জুলিয়াস ফুচিক', 'সাজানো বাগান', 'মারীচ সংবাদ', 'কালাবদর', 'সূর্যশিকার' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছেন। নাট্যতীর্থের (১৯৮২) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি। নাট্যতীর্থে তাঁর অভিনীত নাটক গুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য-'ড.ফস্টাস'(ডালডেস), 'মধ্যমনি' (রমেন), 'কালাবদর'(ইন্দ্র) প্রভৃতি। তিনি নিপুণতার সঙ্গে মঞ্চের কাজ করতেন।

সুখেন্দু চৌধুরী (১৯৪৫---)ঃ

তূণীর নাট্যসংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রথম সম্পাদক সুখেন্দু চৌধুরী ১লা জানুয়ারী ১৯৪৫ সালে অধুনা বাংলাদেশের বগুড়াতে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা ক্ষিতিশ চন্দ্র চৌধুরী, মাতা নিকুঞ্জ দেবী। তিনি বি.এ. পাশ, স্কুল শিক্ষক। তূণীরে অনেকগুলি নাটকে অভিনয় করেছেন।১৯৭৭ সালে নাট্য মন্দিরে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি প্রসংশার সঙ্গে অভিনয় করেন 'মারীচ সংবাদ', 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণ মন্ডলের ঘর গেরস্তি', 'দানসাগর','সাজানো বাগান' প্রভৃতি। ১৯৮২ সালে তিনি নাট্যমন্দির ত্যাগ করেন।১৯৮২ সালে গঠিত নাট্যতীর্থের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। নাট্যতীর্থে তিনি করেছেন- 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণ মন্ডলের গেরস্তী' (মতিশা), 'দানসাগর' (চোর), 'হাজারস্বপন' (নগেন), 'কালাবদর' (সাধু), 'কানামামা' (পুলিশ), 'ডঃ ফস্টাস', 'য্যায়সা কা ত্যায়সা' (হোমিওপ্যাথ), 'খারিজ' (নগেন),ইত্যাদি। তিনি এখনও নাট্যতীর্থের সঙ্গে জড়িত।

দীপক রক্ষিত (১৯৪৫-২০১৮)ঃ দীপক রক্ষিত বালুরঘাটের নাট্যজগতে একজন বিশিষ্ট অভিনেতা এবং পরিচালক। তিনি ১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৫২ বঙ্গাব্দে চিত্তরঞ্জন সেবাসদন কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার ঘাটনগরে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তাঁর পিতা সপরিবারে বালুরঘাট শহরে বসবাস করতে শুরু করেন। তিনি খাদিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৫২ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৬২ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৬৫ সালে ক্লারিক্যাল পদে কালেক্টরেট অফিসে যোগদান করেন এবং দক্ষিণ দিনাজপুর কালেক্টরেট O.S. পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

অতি শৈশব থেকেই তিনি নিজের বাড়িতেই (বাংলাদেশে ঘাটনগরে) যাত্রা নাটকের পোশাক পরিচ্ছেদ দেখেছেন। তাঁদের বাড়িতে যাত্রা নাটকের আসর বসত যার খরচপত্র বহন করতেন তাঁর পিতা। বাড়ির এই পরিবেশই তাঁর নাটক এর প্রতি আকর্ষণ করে। তাঁর বাবার সজ্জিত যাত্রার পোশাক পত্র তরোয়াল দিয়ে সেজে খেলার ছলে তাঁর অভিনয়ের হাতে

খড়ি। ছোট থেকে যাত্রার বাজনা তাঁকে ভীষণ আকর্ষণ করত। বালুরঘাটের দিপালীনগর মাঠে সেই সময়ে যাত্রাদল আসলে ছুটে যাওয়া, যাত্রা দেখতে দেখতে অভিনয় শিল্প তাঁর আপন হয়ে যায়। তাঁর প্রথম দেখা যাত্রা পালা হল 'অকাল-বোধন'। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াকালীন তিনিও অন্যান্যরা মিলে বাড়িতে 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় করেন। 'চন্দ্রগুপ্ত' তাঁর প্রথম অভিনীত নাটক। ১৯৫৫ সালের দিকে অসীম চৌধুরী ও অপু চৌধুরীর বাড়ির বারান্দায় 'হলদীঘাটের যুদ্ধ' নাটকটি করেন। অবশ্য উক্ত বাড়ির অন্দরমহলে মেয়েদের নাটক হত। দীপক রক্ষিতের মা, মাসি, পিসিরাও নাটক করতেন। ১৯৫৬ সালে খাদিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে 'মুকুট' নাটক করেন। ১৯৬১ সালে তিনি একাদশ শ্রেণীতে পড়ার সময় উক্ত বিদ্যালয়ের প্রযোজনায় আবার 'মুকুট' নাটক মঞ্চস্থ হয়। তিনি ছোট ভাই এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। এখানে তিনি স্টেজ করা, সেট-সেটিং করা ইত্যাদি কাজের জন্য তিনি বেস্টওয়ার্কার এর পুরস্কার পান। তিনি পুরস্কার হিসেবে Bengali To English Dictionery চেয়ে নেন। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে বিংশ শতাব্দী ক্লাবের পক্ষ থেকে অনেক গুলি নাটক মঞ্চস্থ হয়। 'বৌদির বিয়ে', 'চৌদ্দপাকে বাঁধা', 'পরাজিত পৃথিবী', 'রক্তে রোয়া ধান', 'থানা থেকে আসছি'- এই সমস্ত নাটকের পরিচালনা ও অভিনয় করেছেন। ১৯৬৮ সালে মধু সাহা, ক্ষিতি গোস্বামী, বিশ্বনাথ চৌধুরী মিলে 'সুন্দরম' নাট্যগোষ্টীর প্রযোজনায় 'কালোমাটির কান্না' একাঙ্কটি বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে একাঙ্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়। পার্শ্ব চরিত্র হিসেবে দীপক রক্ষিত প্রথম হন। ১৯৬৮ সালে নাট্যমন্দিরে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে অন্যান্যদের সঙ্গে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বিচারক ছিলেন। ১৯৬৮ সালে তিনি নাট্যমন্দিরের সদস্যপদ গহণ করেন। নাট্যমন্দিরে তিনি দক্ষতার সঙ্গে বেশ কতকগুলি নাটকের পরিচালনা করেন। 'জুলিয়াস ফুচিক', 'দানসাগর', 'সাজানো বাগান', 'সূর্যশিকার' এই নাটক গুলির পরিচালনা করেছেন। নাট্যমন্দিরে অভিনয় করেছেন 'সোনার হরিণ', 'কালোমাটির কান্না', 'লৌহকপাট', 'শয়তানশ্রী', 'সকালের জন্য', 'ঝুমুর', 'জুলিয়াসফুচিক'(জুলিয়াস), 'দানসাগর', 'সাজানোবাগান', 'কালাবদর', সূর্যশিকার'।

১৯৮২ সালে নাট্যতীর্থ তৈরি হয়। নাট্যতীর্থের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। নাট্যতীর্থ তিনি বহু নাটকে অভিনয় করেছেন। 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণ মন্ডলের ঘরগেরস্তি'(সমশের), 'হরেকৃষ্ণ'(সুবল), 'কালাবদর'(পুটু), 'কানামামা'(মদনমামা), 'সাজানো বাগান'(গোবিন্দ ডাক্তার), 'মহাযুদ্ধ'(দুর্যোধন)। পরিচালনা করেছেন 'দানসাগর', 'হরেকৃষ্ণ', 'কানামামা', 'সাজানোবাগান', 'রবিমীনে', 'মহাযুদ্ধ'।

বিশ্বনাথ মহান্ত (১৯৪৬--)ঃ

বিশ্বনাথ মহান্ত মূলত অঙ্কনশিল্পী। বাংলাদেশের নওগাঁতে জন্ম ১৯৪৬। পিতা রমানাথ মহান্ত। এম.এ. পাশ। শিক্ষাকতা ছিল তাঁর পেশা। ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থায় ১৯৭০ সালে যোগদেন মূলত অঙ্কন শিল্প হিসেবে। আত্মকথনে সংকোচ বোধ করেন। তিনি শিল্পীদের নামে একটি সংস্থা করে তোলেন। নাট্যশিল্পীদের প্রতি ছিল তাঁর ভীষণ আকর্ষণ। নাটকের প্রতি অনুরাগ, অঙ্কন শিল্পে পারদর্শিতার থাকার জন্য প্রথম থেকে ত্রিতীর্থের সমস্ত প্রয়োজনায় তাঁর রূপসজ্জা বিশেষ প্রশংসিত হয়। প্রায় সমস্ত নাটকেই তাঁর নতুন নতুন মঞ্চ পরিকল্পনা সংস্থার নাট্য প্রযোজনাকে সমৃদ্ধ করে। মঞ্চ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে 'কর্ণকুন্তী সংলাপ', 'বন্দি সম্রাট', (শুভ্রাংশু মৈত্রের সঙ্গে) 'চিরকুমার সভা', 'অনিকেত', 'দেবাংশী', 'তুঘলক', 'মন্ত্রশক্তি' ইত্যাদি নাটকে তাঁর কাজ উল্লেখ যোগ্য।

অনিল বরণ মুখার্জী (১৯৪৬--)ঃ

১৯৪৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী বালুরঘাটে মামা নরেশ ব্যানার্জীর বাড়িতে জন্ম। পিতা হরিদাস মুখার্জী, মাতা স্নেহলতা মুখার্জী। প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাদেশের রংপুর মাহিগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অধুনা বাংলাদেশ থেকে চলে আসার পড়ে বালুরঘাট আদর্শ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। স্টেট ট্রান্সপোর্টে কর্মজীবন শুরু করেন ১৯৬৬ সালে। অনিল মুখার্জীর প্রথম অভিনীত নাটক বালুরঘাট রথতলার মুক্তাঙ্গনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বারভূত' নাটকে, সময় ১৯৬০। এরপর তিনি কর্মসূত্রে রায়গঞ্জে চলে যান। রায়গঞ্জে 'ছন্দম' নাট্যগোষ্ঠীতে সুধাংশু দে সম্পাদক থাকাকালীন করেন 'ছেঁড়াতার', 'শেষ থেকে শুরু', 'ফেরারী ফৌজ', 'ডাউনট্রেন'। NBSTC থেকে বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে স্নেহলতা হলে পথের দাবী করেন। এর পূর্বেই তিনি রংপুর থাকাকালীন করেন 'মানময়ী গার্লস স্কুল', 'দুইমহল', 'প্রতিশ্রুতি', 'মীরকাশিম', 'পোড়া বাড়ি'। বালুরঘাট নাট্য মন্দিরে তাঁর প্রথম নাটক 'ছেঁড়াতার'(গোবিন্দ),। এখানে তিনি করেন 'সেম সাইড', 'সমুদ্র সন্ধানে', 'সকালের জন্য', ঝুমুর', 'নীলদর্পন' প্রভৃতি। ১৯৮৩ সালে তিনি চাকুরী সূত্রে অন্যত্র গমন করেন। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে আবার নাট্যমন্দিরে যোগদেন এবং অভিনয় করছেন।

গিরিশ সাহা (১৯৪৬--)ঃ বালুরঘাটের নাট্য আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নাট্যকর্মী হলেন গিরিশ সাহা। সংস্কৃতির জগতে তিনি সমাদৃত হয়েও কোনো অহংকার তাঁর পথভ্রষ্ট করতে পারেননি। স্ফুটমান কৈশোর থেকেই তিনি সংগীত ও অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। সঙ্গে ছিল তাঁর খেলাধুলা। ক্রিড়া জগতেও তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দী। ১৯৪৬ সালের ১লা আগষ্ট কলকাতায় জন্ম। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা বালুরঘাট হাইস্কুল থেকে। এখানে থেকেই আই.এ. এবং কলকাতার কলেজ থকে বি.এ. পাশ করেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী। দীর্ঘদেহী সুপুরুষ ছিলেন গিরিশ সাহা। নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করেন ১৯৬৭ সালে। তিনি দীর্ঘসময় কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং সম্পাদক ছিলেন। 'ওরাও মানুষ', 'ক্যাপ্টেনহুররা', 'রাজদর্শন', 'ঝুমুর', 'অমৃতঅতীত', 'তীর্থযাত্রী' প্রভৃতি নাটকে চরিত্র থেকে চরিত্রে অনায়াস বিচরণ দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। তাঁর অভিনীত অন্যান্য নাটক- 'সেমসাইড', 'কালোমাটির কান্না', 'লৌহকপাট', 'জুলিয়াস ফুচিক', 'সূর্যশিকার', 'পথেরদাবী', 'বৌদির বিয়ে' প্রভৃতি। তিনি পরিচালক হিসেবে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পরিচালিত নাটকগুলি হল- 'রাজদর্শন','তীর্থযাত্রী', 'শাস্তি', 'দুইচোরের গল্প', 'আমি এ চাইনি'।

নাটক তাঁর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। তাই তাঁর রোগগ্রস্থ কন্ঠ থেকে শুনেছিলাম দীর্ঘদিন পূর্বে অভিনীত 'শাস্তি' নাটকের সামান্য ত্রুটির কথা।

অজিত কুমার সরকার(১৯৪৬--)ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের বোয়ালদাড়ে জন্ম। পিতা অমূল্যচরণ সরকার, মাতা সবিতা দেবী। বোয়ালদাড় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ, বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে হায়ারসেকন্ডারী পাশ করেন ১৯৬৪ সালে। বালুরঘাট কলেজ থেকে স্নাতক ১৯৬৬ সালে। কর্মজীবনে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ২০০৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। পরিবারে যাত্রা নাটকের পরিবেশ ছিল। বাবা অমূল্যচরণ সরকার যাত্রাভিনয় করতেন এবং বোয়ালদাড় নাট্য সংস্থার প্রতিষ্ঠা সদস্য। 'আজকাল' নাটকে তিনি প্রথম অভিনয় করেন। বোয়ালদাড়ে তিনি বেশকতকগুলি নাটকে অভিনয় করেছেন কিন্তু নাটক অভিনয়

ছাড়াও তিনি নেপথ্যকর্মী হিসেবে সংস্থার গুরুত্ব পূর্ণভূমিকা পালন করতেন।

সাধন মজুমদার(১৯৪৭---)ঃ

১৯৪৭ সালে ২রা আগষ্ট বালুরঘাটে জন্ম। পিতা ভবগোপাল মজুমদার, মাতা অনিলা দেবী। বালুরঘাট হাইস্কুল থেকে প্রাথমিক এবং এখান থেকেই স্কুল ফাইনাল পাশ করেন ১৯৬৪ সালে। প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে কাশিম্বী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৮১ তে যুক্ত হন। ১৯৮২ সালে সুলেখা মজুমদারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৭২ সালে তিনি 'ত্রিতীর্থ' নাট্যসংস্থায় প্রবেশ করেন এবং এখানেই তিনি প্রথম সার্থক অভিনয় করেন- 'শেরআফগান' নাটকে। ত্রিতীর্থে তিনি করেন 'বিজ্ঞাপন'(সাধন), 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'তিনবিজ্ঞানী' (মফিজ এবং আইনস্টাইন), 'ভাঙ্গাপট'(গ্রামবাসী), 'দেবীগর্জন'(মংলা), 'শিশুপাল', 'পরবাস' (বৃদ্ধ প্রধান) 'কর্ণকুন্তি সংলাপ', 'গ্যালিলেও'(ফুলগানজোনি)। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৯সাল পর্যন্ত ত্রিতীর্থে অভিনয় করেছেন। পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে সাধন মজুমদারতো বটেই সঙ্গে অমিতাভ সেন (দুলু), সত্যরঞ্জন তালুকদার, প্রভাস সমাজদার, পুষ্প সমাজদার ত্রিতীর্থ থেকে বেড়িয়ে আসেন। সাধন মজুমদারের বক্তব্য ''তাঁদের বেড় করে দেওয়া হল''[২৩]। ১৯৮০ সালে তিনি নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করেন এবং নাট্যমন্দিরে পরিচালনা ও অভিনয় করেছেন। নাট্যমন্দিরে তাঁর প্রথম পরিচালিত ও অভিনীত নাটক 'গুলসন' ১৯৮২ সালে। তাঁর অভিনীত ও পরিচালিত নাটক গুলি হল-'গুলসন' (ভূতনাথ), 'প্রস্তুতি'(চিরঞ্জিত), 'দর্পনসাক্ষী'(পার্শ্বচরিত্র), 'দুইচোর', 'খেলওয়ালা', 'দায়বদ্ধ'(ড্রাইভার), 'বাঘিনী' প্রভৃতি নাটক। এছাড়াও পরিচালনা করেছেন- 'ভূ-ভারহরণ করপোরেশন'।

তিনু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭--)ঃ ১৯৪৭ সালের ১৪ই নভেম্বর বালুরঘাট শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মাতা ননিবালা দেবী। বালুরঘাট হাইস্কুল থেকে হায়ারসেকেন্ডারী পাশ এবং সিটি কলেজ থেকে ১৯৬৭ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। প্রথম জীবনে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কলকাতার বাটা কোম্পানীতে চাকরী করেন। ১৯৬৮ সালে কলকাতা থেকে বালুরঘাটে চলে আসেন। বালুরঘাটে তিনি ট্রান্সপোর্ট বিজনেস করতেন। ১৯৭৬ সালে আন্ত জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তাকে নাটকের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেন। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় তাঁকে বলেছিলেন- ''সাহস থাকলে আয়, তা না হলে আসিস না।''[২৪] এই কথাটি তার মনে প্রচন্ড ধাক্কা দিয়েছিল। এরপর তিনি ত্রিতীর্থ গেলেন এবং বিমল করের লেখা 'কর্ণকুন্তিসংলাপ' নাটকে ছেলের পাঠ দিয়ে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু হল। 'পরবাস'(পরাগ), 'নাটককারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র'(ছেলে), 'দেবীগর্জন'(খগেশ্বর, মোঙ্গলা,সঞ্চারিয়া), 'তিনবিজ্ঞানী'(আইনস্টাইন), 'শিশুপাল','বল্লভপুরের রূপকথা'(সাহ), 'ক্ষুরস্যধারা'(নির্মল), 'গ্যালিলিও'(বড় আন্দ্রেয়া), 'জল'(ধুরা, মাস্টারমশাই), 'তুঘলক'(রতন সিং), 'দেবাংশী'(দেবাংশী), 'অর্থম্ অনর্থম্'(অজিত), 'বিছন'(করণ), 'চিরকুমার সভা', 'অনিকেত'(ছেলে), নাটকে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছেন। 'দেবাংশী' নাটকের দেবাংশী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি ১৯৮৮ সালে 'দিশারী' পুরস্কার লাভ করেন। 'জল' নাটকের অভিনয় দেখে মহাশ্বেতা দেবী তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়কে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন-''আমি যে চরিত্র লিখেছি আজ আমি জীবন্ত

চরিত্রটা চলাফেরা করতে দেখছি।''[২৫] তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন-''আমার শিল্প সত্তা কেবল প্রস্ফুটিত হতে শুরু করেছিল তখন আমার নাটক ছাড়তে হয়েছে।''[২৬] ১৯৯০ সালের পর তিনি আর অভিনয় করেননি। তবে অল্প সময়ে অভিনয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন।

গৌতম সেন (১৯৪৯---)ঃ

অভিনেতা গৌতম সেন ত্রিতীর্থের নির্ভরযোগ্য অভিনেতা। ১৯৪৯ সালের ৯ই মে বালুরঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা নরেন্দ্র মোহন সেন। ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থায় তাঁর নাট্যজীবনের সূচনা। ত্রিতীর্থের সম্পাদক ও ছিলেন। তাঁর প্রথম নাটক 'শের আফগান'। পরবর্তীতে যেসব নাটক উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন সেগুলি হল 'তিনবিজ্ঞানী', 'দেবীগর্জন', 'শিশুপাল', 'মঙ্গলাচরণের বিবাহ', 'বন্দিসম্রাট', 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'পরবাস', 'গ্যালিলেও', ক্ষুরস্য ধারা', 'জল', 'তুঘলক', 'দেবাংশী', 'বিছন', 'চিরকুমারসভা'।

স্বপন নিয়োগী (১৯৪৯---)ঃ

স্বপন নিয়োগী অভিনয়ে ও মঞ্চের যাবতীয় কাজ করেন। ১৮.৮.১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্থানের টাঙ্গাইলে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সরোজকান্তি নিয়োগী, মাতা সতীরাণী দেবী। ১৯৬০ সালে পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ গ্রহণ কালে তিনি বালুরঘাটে আসেন। এখানে তিনি প্রথমে বালুরঘাট হাইস্কুল ও পরে ললিতমোহন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে অনেকগুলি নাটকে অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য 'মারিচ সংবাদ', 'সাজানো বাগান' প্রভৃতি। নাট্যতীর্থ নাট্যসংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। নাট্যতীর্থে তিনি প্রধানত নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে সমস্ত রকম কাজ করেন। মেক-আপ, পোষাক নির্বাচন, নাটকের আনুসঙ্গিক জিনিস পত্র আনয়ন ইত্যাদি। নাট্যতীর্থেও তিনি অভিনয় করেছেন।

জয়ন্ত বিশ্বাস (১৯৪৯-১৯৯২)ঃ অভিনেতা নিরঞ্জন বিশ্বাসের পুত্র জয়ন্ত বিশ্বাস। বালুরঘাট থেকেই তিনি স্নাতকস্তর পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করেছেন। B.T.C বালুরঘাটে কর্মরত ছিলেন। পারিবারিক সূত্রেই অভিনয় প্রতিভা পেয়েছিলেন। জয়ন্ত বিশ্বাস ছিলেন তূণীরের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন ও কয়েকটি নাটক পরিচালনা করেছেন। তূণীরের 'শতাব্দীর পদাবলী', 'ছুটির ফাঁদে' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেন। পরিচালনা করেছেন- 'গিনিপিক', 'শতাব্দীর পদাবলী' (যৌথ)। তিনি ভালো ফুটবলও খেলতেন, গোলরক্ষক ছিলেন। নাটক নিয়ে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করতেন। তিনি বয়:জেষ্ঠ্যদের সঙ্গে ও সমান ভাবে নাটক নিয়ে আলোচনা করতেন। ব্যক্তিগত জীবন বলতে তাঁর তেমন কিছু ছিল না। চাকুরী সূত্রে পাটনা গিয়ে সেখানে বেঙ্গলী ক্লাবের সদস্য হতে তাঁর অসুবিধা হয় নি। বালুরঘাট হাসপাতালের বিছানায় শুয়েও তাঁর অক্ষেপ- জিষ্ণু নিয়োগীকে বলেছে-'' কি রে শুনলাম সন্ন্যস্ত'তে তুই আর কুট্টি ভাল কাজ করেছিস-ইস আমার আর দেখা হল না....''[২৭], তিনি আরও বলেন-''জানিস জিষ্ণু আমিও কিন্তু এখন একটা নাটকের চরিত্র।''[২৮]

১০ই জুন ১৯৯২ এ জয়ন্ত স্মৃতি বাসর অনুষ্ঠিত হয় তূণীর এর ব্যবস্থাপনায় সেখানে স্মৃতি চারণে নাটককার, নির্দেশক ও অভিনেতা হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বলেন-'' এমন কি

কাজ করলে সর্বস্তরের নাট্যকর্মীরা একজনকে ভালোবেসে স্মৃতি সভায় ব্যাপক ভাবে উপস্থিত হয়? ... হৃদয়কে অনেক বড়ো করা দরকার যা ছিল জয়ন্তর এবং আজকের স্মৃতি বাসরে অন্য কেউ না হোক, অন্তত: আমি নিজে এই শিক্ষাই গ্রহণ করলাম।''[২৯]

১৯৯২ সালে ৭ই জুন নাটকের মায়াত্যাগ করে ইহলোক ত্যাগ করেন।

দেবব্রত চক্রবর্তী(১৯৫০-২০১৭)ঃ

দেবব্রত চক্রবর্তী দেবু বলে পরিচিত। পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলায় ১৯৫০ সালে ৬ই জানুয়ারী জন্ম। পিতা সুনীল চক্রবর্তী, মাতা কাজলরাণী দেবী। গ্রাজুয়েট ছিলেন। বালুরঘাট সমাহর্তালয়ে চাকরী করতেন। দেবব্রত চক্রবর্তীর মা খুব সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর উৎসাহেই ছেলে দেবু নাটকে অংশ গ্রহণ করেন। দেবব্রত চক্রবর্তী দক্ষ অভিনেতা ছিলেন। তিনি ভালো তবলাবাদক ছিলেন। প্রথমে তিনি নাট্যমন্দিরে (১৯৮১) ছিলেন। নাট্যমন্দিরে কয়েকটি নাটকে অভিনয় করেছেন। বালুরঘাট নাট্যতীর্থের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। নাট্যতীর্থের সম্পাদক থাকাকালীন তিনি দেহ ত্যাগকরেন ৩০.০৬.২০১৭ তারিখে। বালুরঘাট নাট্যতীর্থে তাঁর অভিনীত নাটকগুলি হল-'দানসাগর' (নিতাই), 'কালাবদর'(কুঞ্জুবাবু), সাজানো বাগান(পুরোহিত), 'রবিমীনে' (কুঞ্জু), 'ড.ফস্টাস'(দ্বিতীয় জ্ঞানী), 'বাদ্যকার'(দেবব্রত চক্রবর্তী), 'মধ্যমনি'(নিমুদা), 'মহাযুদ্ধ'(অভি), 'ধূয়ো ধূলো নক্ষত্র'(অধীর চ্যাটার্জী)।

চয়নিকা গুহরায় (১৯৫০--)ঃ

ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার অভিনেত্রী চয়নিকা গুহরায় 'বাচ্চি' নামে পরিচিত। ১৫.০৩.১৯৫০ সালে বালুরঘাটে জন্ম। পিতা সত্যরঞ্জন গুহরায়, মাতা রেণুকণা দেবী। প্রাথমিক থেকে হায়ার সেকন্ডারী বালুরঘাট গার্লস স্কুল। বালুরঘাট কলেজ থেকে স্নাতক ১৯৭০ সালে। ১৯৭৮ সালে স্থায়ী ভাবে বালুরঘাট কালেক্টরেট এ L.D.C (লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক)। U.D.C থেকে ১৯৯০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। পারিবারিক ভাবেই তিনি নাটকে প্রেরণা পেয়েছেন। বিখ্যাত অভিনেতা শান্তিরঞ্জন গুহের ভাইয়ের মেয়ে চয়নিকা গুহ রায়। তাঁদের পরিবারকে অনেকে 'নাটুকে পরিবার' বলে থাকেন। শান্তিরঞ্জন গুহের হাত ধরেই তাঁর নাট্য ক্ষেত্রে প্রবেশ। অভিনেতা, পরিচালক, নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের সামনে একটি ছোট অভিনয়ের পরীক্ষা দিয়ে তাঁর ত্রিতীর্থে প্রবেশ। ১৯৬৯ সালে তিনি ত্রিতীর্থে প্রবেশ করেন। ত্রিতীর্থে প্রবেশের পূর্বেই তিনি ৫-৬ বছর বয়সে কাকা শান্তিরঞ্জন গুহের সঙ্গে অভিনয়ের মহড়া দেখতে যেতেন। ১০-১১ বছর বয়স থেকেই তিনি পাড়ায় ও স্কুলে নাটক করতেন- 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', 'তাসের দেশ' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছেন। ত্রিতীর্থে প্রবেশ করেই তাঁর অভিনয় প্রতিভার বিকাশ হয়। এখানে অভিনয় করেই তিনি সুনাম অর্জন করেন। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ও শান্তিরঞ্জন গুহের হাত ধরেই তিনি অভিনয়ে দক্ষ হয়ে ওঠেন। ত্রিতীর্থে তাঁর প্রথম অভিনয় 'অমৃতস্য পুত্রা:'(আদি নারী), 'সংকট', 'বিজ্ঞাপন'(সুমি), 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'(দুর্গা), 'তিন বিজ্ঞানী' (মেট্রন মজুমদার), 'দেবীগর্জন'(গিরিবালা), 'ভাঙ্গাপট'(মতির মা), 'গ্যালিলিও'(সার্ত্তি), 'শিশুপাল'(গ্রামবাসী), 'জল' (মঘাই ডোমের স্ত্রী), 'দেবাংশী'(মোড়লের স্ত্রী), 'মন্ত্রশক্তি, 'অসমাপিকা (শাশুড়ী) প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছেন। 'জল' নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পর চয়নিকা গুহরায় অভিনয় সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়-প্রদোষ মিত্র চয়নিকা গুহরায় সম্পর্কে বলেছেন-''মহিলা চরিত্রে চয়নিকা গুহ

সুন্দর। পাকা অভিনেত্রী। তাছাড়া বাচ্চা কোলে ক'রে অত সুন্দর নাচবার সাহস ক'জনের আছে।''[৩০] ''ফুলমনি চয়নিকা গুহরায় প্রাণ উজার করে অন্তর দিয়ে অভিনয় করে তার অভিনয় ক্ষমতা প্রতিভাত করেছেন। বিশেষ করে ভগবানের কাছে তার আর্তি এ নাটকে অমূল্য সম্পদ।''[৩১] ১৯৮২ সালে অসীমপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বামী অসীমপ্রসাদ রায় তার অভিনয়ে কোনো দিন বাধা দেননি বরং তাঁর অভিনয়ে সাহায্য করেছেন। চয়নিকা গুহরায় যখন সন্তান সম্ভবা তখনও তাঁর স্বামী কলকাতায় নিয়ে গেছেন অভিনয়ের জন্য।

সন্ধ্যা কর্মকার (১৯৫০---)ঃ

আদি বাড়ি ঢাকা, রাজবাড়ি গ্রামে। ১৯৫০ সালে জন্ম। পিতা সুরেন্দ্র চন্দ্র কর্মকার, মাতা চিনুবালা দেবী। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে তিনি বড়। শিশু বয়সেই সপরিবারে মাইগ্রেশন করে তাঁর বাবা কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতার বেহালার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু। কলকাতা থেকে তাঁরা প্রথমে আসেন রায়গঞ্জে এবং পরে বালুরঘাটে এসে খাদিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। সমাজ কল্যান যোজনা সমিতি তে সাত বছর কাজ করার পরে ১৯৭২ সালে আমিন বুনিয়াদী বেসিক স্কুলে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন। পাড়ার মেয়েরা ছেলে সেজে প্রাচ্যভারতী মঞ্চে অভিনয় করতো সেটা দেখতে দেখতে তাঁর নাটকের প্রতি ঝোক সৃষ্টি হয়। অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় তিনি 'নটীবিনোদিনী' নাটকে প্রহরী ভূমিকায় অভিনয় করেন। এরপর করেছেন 'নিমাই সন্ন্যাস' এবং 'স্বীকৃতি' নাটক। ১৯৮৪ সালে নাট্যমন্দিরে সদস্যপদ নেন এবং সেখানে তাঁর উল্লেখ যোগ্য নাটক, 'প্রস্তুতি' (মা), 'বাঘিনী'(মাসি), 'গুলশন'(বৌ), 'শাস্তি'(বড়বৌ), 'চাকরী সূত্রে কুশমন্ডিতে থাকা কালীন ওখানেও তিনি বেশ কতকগুলি নাটক করেছেন। তিনি গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত আছেন। সমাজ সমস্যা সংক্রান্ত যেমন পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, সাক্ষরতা প্রভৃতি বিষয় দিয়ে তিনি গ্রামে গ্রামে সচেতনতা মূলক নাটক করেছেন। কুশমন্ডিতে 'শুধু একটি বছর' নাটকে বড় দিদির রোল করে পুরস্কৃত হয়েছেন।

কমল দাস, কল্যান (১৯৫১---)ঃ

কমল দাস বালুরঘাটের নাটকের ক্ষেত্রে নয়, বালুরঘাটের পুরনো কথা জানতে হলে কমল দাস অপরিহার্য। নাটক ও সংস্থাগত প্রাণ কমল দাস নিজেকে 'থিয়েটারের শ্রমিক' বলে পরিচয় দেন। ছোট খাটো চেহারা, মাথায় টুপি, ঢিলেঢালা পোষাকের উপর একটা হাফ কোর্ট, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, বাই সাইকেল নিয়ে সমগ্র বালুরঘাট চষে বেড়ান মনের খিদে মেটানোর জন্য। সঙ্গে থাকে তাঁর মূল্যবান ক্যামেরা, ভালো ফটোগ্রাফারও তো তিনি। তথ্যসংগ্রহকারী ও সংরক্ষক কমল দাস ত্রিতীর্থ নাট্য সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ১৯৫১ সালের ১৩ই মার্চ বালুরঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মনোরঞ্জন দাস, মাতা অনু দেবী। ১৯৬৯ সালে বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বালুরঘাট কলেজ সান্ধ্য বিভাগে ভর্তি হয়ে দু'বছর পড়াশোনা করলেও বি.কম. ফাইনাল পরীক্ষা দেননি। পারিবারিক অর্থনৈতিক কারণে ছোট ছোট কিছু কাজ করার পর ১৯৭৪ এ জলসম্পদ উন্নয়ন বিভাগে সরকারী চাকুরীতে যোগদেন এবং ২০১১ সালে অবসর গ্রহণ। বালুরঘাটের যে ঐতিহ্য ছিল পাড়ায় পাড়ায় নাটক, গ্রীষ্মের ছুটির নাটক, বিজয়া সম্মিলনী নাটক এগুলি দেখেই বড় হয়েছেন এবং অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

পাড়ার ক্লাব ব্রতীসংঘে প্রতিবছর নাটকে অভিনয় করার মধ্য দিয়ে তাঁর নাটকের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। বালুঘাট কলেজের পড়ার সময় ১৯৭১/৭২ সালে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় পর পর দুটি নাটকে অভিনয় করে প্রথম পুরস্কার পান। এই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাটকের প্রতি অসম্ভব ভালো লাগা তৈরি হয়। এই সময়ে তিনি 'যাত্রিক' ও 'কচিকলা একাডেমী'র নাটক গুলিতে অভিনয় করেছেন।

১৯৭৩ সালে গঠিত 'তূণীর' নাট্যসংস্থার প্রতিষ্ঠিত সদস্য। উক্ত সংস্থার প্রযোজনায় তিনি অভিনয় করেন 'শতাব্দীর পদাবলী','অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণমন্ডলের ঘর গেরস্তি','ছুটির ফাঁদে'। নাটকগুলির অভিনয়ে তিনি প্রশংসিত হন। ত্রিতীর্থে নাটক গুলি তিনি দেখতেন। ''১৯৭৬ সালে তূণীর নানা কারনে প্রযোজনা করতে পারছিল না কিন্তু অভিনয় এবং নাটকের খিদের জন্য হরিমাধব মুখোপাধ্যায়কে বলি আমি ত্রিতীর্থে যোগ দিতে চাই। উনি দু'দিন পরেই আমাকে দলে আসতে বলেন। ১৯৭৬ এর ১৬ই জুন আমি ত্রিতীর্থে যোগ দিই। তিনি বলেন 'শুধু অভিনয় নয় একজন মানুষ থিয়েটারের মধ্য দিয়ে নিয়মানুবর্তিতা, সত্যতা, নিষ্ঠা, পারঙ্গমতা সবই শেখে।' সেই শুরু থেকে আজ অবধি বহু দোষ থাকা স্বত্ত্বেও আমাকে দল সহ্য করে।''[৩২] ত্রিতীর্থে তাঁর প্রথম নাটক 'বন্দী সম্রাট'। এরপর তিনি করেন 'দেবীগর্জন','পরবাস','জল'(পারশ), 'দেবাংশী', (বুড়োগ্রামবাসী), 'মন্ত্রশক্তি', 'অর্থম্ অনর্থম',(ফণীভূষণ), 'বিছন'(দুলন), 'অসমাপিকা', 'লুকোচুরি','পণন'(কুঞ্জ হালদার), 'সরল অঙ্ক'(চোর), 'পত্রশুদ্ধি'(বৃন্দা), 'বিপুলৌষধি'(তারিণী কবিরাজ) প্রভৃতি। 'বিছন' নাটকে দুলন চরিত্র অভিনয়ে বহু প্রশংসিত হয়েছেন। 'যুগান্তর' এ লেখা হয় -''কমল দাসের দুলন অন্তর ছুয়ে যায়। চলনে বলনে অভিব্যক্তিতে কমল দক্ষ।''[৩৩] 'বিছন' দুলনের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য 'উত্তরবঙ্গ নাট্যজগৎ' পত্রিকা গোষ্ঠী প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান।

প্রদোষ মিত্র (১৯৫২--)ঃ

অভিনেতা, পরিচালক প্রদোষ মিত্র ১৪.০৩.১৯৫২ সালে দার্জিলিং এর কালিম্পং এ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা পূর্ণেন্দু ভূষণ মিত্র, মাতা শোভনা দেবী। কৈশোরোত্তর বয়স থেকেই তাঁর বাস বালুরঘাটে। তিনি স্নাতক, চাকুরীজীবি। একটি একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার জন্য 'অন্ধকারায়' নাটকটি তাঁর প্রথম পরিচালিত নাটক। এরপর তিনি পরিচালনা করেন 'অস্তমিত গান' ও 'ভোরের স্বপ্ন'। বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে যোগদেন ১৯৭০ সালে। সেখানে তিনি করেছেন 'ঝুমুর', 'ক্যাপ্টেন হুররা', 'সকালের জন্য'। নাট্য মন্দিরে অভিনয় করলেও পরিচালনার সুযোগ পাননি। সেই জন্যেই কয়েকজন উৎসাহী যুবকদের নিয়ে স্বতন্ত্র নাট্যদল গড়ে তোলেন 'তূণীর' (১৯৭৩)। তূণীরে তিনি নাটক পরিচালনা, সঙ্গীত পরিচালনা ও অভিনয় করেছেন। তূণীরে তিনি পরিচালনা করেন 'অগ্নিগর্ভে হেকেমপুর ও পরাণ মন্ডলের ঘর গেরস্তী', 'চেতনা', 'পাকাল', ' একাঙ্ক', 'শেষরক্ষী', 'গোধুলীবেলায়', 'সন্ন্যস্ত'। তূণীর থেকে বেড়িয়ে এসে তিনি নতুন নাট্যদল গড়ে তুললেন 'বালুরঘাট নাট্যকর্মী'(১৯৯৩)। বালুরঘাট নাট্যকর্মীতে তিনি পরিচালনা করেন-'ন্যায়', 'সানাই', 'দ্য জাষ্ট', 'নিয়ম ও ব্যতিক্রম', 'ঝুমুর'। এরপর তিনি বালুরঘাট নাট্যকর্মী থেকে বেড়িয়ে গিয়ে গঠন করেন 'বালুরঘাট সমবেত নাট্যকর্মী' (২০০৬)। এখানে করেন 'একদুই'। তিনি সক্রিয় ভাবে নাট্য শিল্পের সঙ্গে জড়িত।

সঞ্চিতা রায়গুপ্ত (১৯৫২---)ঃ

সঞ্চিতা রায়গুপ্ত বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। বালুরঘাট, চক্ভবানীতে ২০ই এপ্রিল ১৯৫২ তে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মনীন্দ্র নাথ রায়গুপ্ত, মাতা অনুপা দেবী। বালুরঘাট অভিযাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক স্তরের পড়াশোনা করেন। বালুরঘাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে হায়ারসেকেন্ডারী পাশ করেন ১৯৭২ সালে। ১৯৮৪ সালে ICDS বিভাগে চাকুরী পান। উচ্চমাধ্যমিক পড়ার সময় ফ্রেসাস ক্লাবে তিনি প্রথম নাটক করেন। দাদার বন্ধু তাকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেন। ১৯৭২ সালের তাঁর প্রথম নাটক 'প্রস্তাব'(নমিতা)। 'প্রস্তাব' নাটকটি করার পর 'অভিযাত্রী' নাট্যসংস্থা তাঁকে নিজেদের দলে ডেকে নেন। 'অভিযাত্রী' নাট্যসংস্থাতে তিনি প্রথম করলেন সুধাংশু দাশগুপ্তের 'আমি এ চাইনি'। এই নাটকটি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বলে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। 'অভিযাত্রী' নাট্যসংস্থা যখন বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের সঙ্গে মিশে যায় তখন তিনিও নাট্যমন্দিরের সদস্য হন। 'আমি এ চাইনি' নাট্যমন্দিরের প্রযোজনায় 'সারা আসাম বাংলা একাঙ্ক বাংলা নাটক প্রতিযোগিতা'য় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান। সময় সম্ভবত ১৯৭৩-৭৪। নাট্যমন্দিরে তিনি অভিনয় করেন 'মরজিনা আবদুলা' (মরজিনা), 'টিনের তলোয়ার'(নায়িকা), 'গুলসন' (বাড়িওয়ালী), 'সূর্যশিকার (নায়িকা), 'জীবনদর্পন'। 'উষাহরণ' রেডিও ড্রামা রেকর্ডিং হয়েছিল আকাশবানী কলকাতা থেকে। উষাচরিত্রে পাঠ করেছিলেন তিনি। সময়টা আটের দশক। গঙ্গা যমুনা নাট্যোৎসবের আয়োজক ভারতীয় গণনাট্যসংঘ শপথ শাখা ও অনীক নাট্যসংস্থা (কলকাতা) ২০১৩ সালে বালুরঘাটের শ্রেষ্ঠ (প্রথিতযশা) অভিনেত্রী হিসেবে সম্মানিত করেন। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি অভিনয় জগতে ছিলেন।

সান্তনা গুহ (১৯৫২---)ঃ

বাবা শান্তিরঞ্জন গুহ ছিলেন অসাধারণ নাট্যপ্রতিভার অধিকারী। বাবার হাত ধরেই অভিনেত্রী সান্তনা গুহ নাট্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। সান্তনা গুহের জন্ম ১৯৫২ সালের ১৯শে অক্টোবর। মা প্রতিমা দেবী। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন ১৯৬৯ সালে। বালুরঘাট কলেজ থেকে ইতিহাস বিষয়ে স্নাতক হন ১৯৭২ সালে। ১৯৭৯ সালে জয়ন্ত কুমার দের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন বিবাহের পর তিনি ১৯৮০ সালে জনশিক্ষা প্রসারের দপ্তর বালুরঘাটে জয়েন্ট করেন। ২০১২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ত্রিতীর্থে 'অমৃতস্য পুত্রা:' নাটকের অভিনয় দিয়ে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু। এখানে তিনি করেছেন 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র'(মা), 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'(মেয়ে), 'দেবীগর্জন'(রত্না), 'বন্দী সম্রাট'(ময়ূরী), 'ভাঙ্গাপট'(ইতু), 'তিন বিজ্ঞানী'(মণিকা), 'পরবাস'। পড়াশোনা সূত্রে মালদা থাকাকালীন 'মাদাম কুড়ি' নাটকে মাদামকুড়ির অভিনয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পারিবারিক ব্যস্ত জীবন দূরে চাকরী সমস্ত কিছু সামলে নিয়ে তিনি অভিনয় করতেন। এই ভাবে অভিনয় করতে করতে তিনি নাট্যজীবন থেকে অবসর নেন।

অঞ্জুশ্রী দাস (১৯৫২---)ঃ

বালুরঘাট পুরাতন কংগ্রেস পাড়া ০৩.১২.১৯৫২ তারিখে জন্ম। পিতা ননি গোপাল দাস, মাতা রেবারাণী দেবী। বালুরঘাট মনিমালা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে চতুর্থ শ্রেণী পাশ করে খাদিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯৭৪ সালে হায়ারসেকন্ডারী পাশ করেন।

কালেক্টরীতে ক্লার্ক পোষ্টে কর্মজীবন শুরু। ১৯৫৫ সালের ৩১শে মে তিনি রমেন্দ্র নাথ সরকারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ভূমিসংস্কার দপ্তর থেকে ২০১২ সালে অবসর গ্রহণ।

প্রণব চক্রবর্তীর (ঝন্টু) প্রেরণায় তিনি নাটকে প্রবেশ করেন। অচিন্ত্য গোস্বামী তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছেন। কলেজে পড়াশোনা চলাকালীন তিনি প্রণব চক্রবর্তী, অচিন্ত্য গোস্বামী, অমলেশ মিত্রের সংস্পর্শে আসেন এবং অভিনয় জগতে প্রবেশ করেন। তাঁর প্রথম নাটক 'ছেঁড়াতার'। 'ছেঁড়াতার' নাটকে তিনি ফুলমনির ভূমিকায় অভিনয় করেন। এর পর তিনি ক্রমান্বয়ে অভিনয় শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। 'সাজানো বাগান'(পদ্ম), 'রাজদর্শন' (দাসী), 'জুলিয়াস ফুচিক' (নায়িকা), 'বাঘিনী'(পার্শ্বচরিত্র), প্রভৃতি নাটকে অসাধারণ অভিনয় করেছেন। ২০১০ সাল থেকে অসুস্থতার কারনে তিনি আর অভিনয় করেন না কিন্তু তিনি এখনও নাটক ভীষণ ভালো বাসেন।

মালবিকা খাঁ (১৯৫২-১৯৯৯)ঃ

বালুরঘাটের সংস্কৃতির জগতের সারা জাগানো ব্যক্তিত্ব মালবিকা খাঁ। সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় সমস্ত কিছু মিলেই ছিল তাঁর সাংস্কৃতিক জীবন। ১৯৫২ সালে ২১শে অগ্রহায়ণ মাসে বালুরঘাটে জন্ম। পিতা ভনা খাঁ, মাতা শান্তি খাঁ। পিতা মাতা দু'জনেই নাট্যশিল্পী ও সুগায়ক ছিলেন। ১৯৭১ সালে রনেন গোস্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রথম জীবনে স্বামী স্ত্রী দু'জনেই বালুরঘাট কালেক্টরেট অংশকালীন চাকরী করতেন। ১৯৮২ সালে স্কুল শিক্ষিকা হন। মূলত তিনি ছিলেন গানের শিক্ষিকা। বালুরঘাটের কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্র সঙ্গীত থেকে শুরু করে ভক্তি মূলক গান সব রকমের গান করতেন। তাঁর নাট্য জীবন দীর্ঘ নয়। কিন্তু একটি নাটক 'ঝুমুর' এ রাধাবালার অভিনয় বালুরঘাটের নাট্যাতিহাসে এবং বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা। নিজের কণ্ঠে গান ও নৃত্য সহযোগে রাধাবালা অভিনয় প্রতিভার কথা প্রবীণদের মুখে মুখে।

রানা রায় (১৯৫২-১৯৯৬)ঃ

দক্ষ অভিনেতা রানা রায় ১৯৫২ সালে বালুরঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা শৈলেন রায়। ব্যবসায়ী রানা রায়ের প্রথম নাটক প্রদোষ মিত্রের নির্দেশিকায় 'ঈশ্বরবাবু আসছেন' নাটকে (১৯৭২)। ১৯৯৪ সালে তিনি তূণীর প্রবেশ করেন সেখানে তিনি একটি মাত্র নাটকে অভিনয় করেছেন।'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণ মন্ডলের ঘর গেরস্তী'(১৯৭৬)। ১৯৭৫ সালেই তিনি ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থায় যোগদেন। এখানে তিনি করেন 'দেবীগর্জন', 'বিজ্ঞাপন', 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'বিছন', 'দেবাংশী' ইত্যাদি নাটকে তিনি অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। তাঁর শেষ নাটক 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'(১৯৯৪) নবপর্যায়। ১৩.৮.১৯৯৬ সালে তাঁর অকাল প্রয়াণ ঘটে। তাঁর অকাল প্রয়াণে বালুরঘাটের নাট্যজগতে একটি সম্পদ হারিয়ে যায়।

রীতা দত্তগুপ্ত (১৯৫৩---)ঃ

রীতা দত্তগুপ্ত ১৯৫৩ সালের ২৮শে জানুয়ারীতে মালদার রতুয়াতে জন্ম। পিতা দেবেন্দ্র দত্তগুপ্ত, মাতা চারুবালা দেবী। বাবার চাকুরী সূত্রে তিনি বালুরঘাটে আসেন। বালুরঘাট

কলেজ থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে স্নাতক। ১৯৭৯ সালে ১৫ই ফেব্রুয়ারী অরুণ কুমার দাসগুপ্তের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর ২৫ বছর নাগাল্যান্ডে থাকার পর নাটকের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। বালুরঘাটে এসে তাঁর বড়দাদার মাধ্যমেই হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এর সঙ্গে পরিচয়। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এর কাছ থেকেই তিনি নাটকের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ত্রিতীর্থ ছাড়া অন্য কোথাও অভিনয় করেননি। 'নাট্যকারের সন্ধ্যানে ছ'টি চরিত্র', 'তিন বিজ্ঞানী', 'ভাঙ্গাপট', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'বৃষ্টি বৃষ্টি' ইত্যাদি। ১৯৭০ সালে লক্ষ্মৌতে 'সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায় 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেন।

অমিত সরকার (১৯৫৩---)ঃ সংস্কৃতি মনস্ক গ্রাম বোয়ালদাড়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস এই গ্রামে, এই গ্রাম সংস্কৃতির ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯৪২ সালে বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে সংস্কৃতি মনস্কতা নিয়ে সেই ঐতিহ্য আজও বহমান। এই প্রবাহ যাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন অমিত সরকার। জন্ম ১৯৫৩ সালের ২৫শে অক্টোবর বোয়ালদাড় গ্রামে। পিতা অমিয় সরকার, মাতা শান্তি দেবী। বোয়ালদাড়ে তাঁর প্রাথমিক পাঠ শুরু। কালিকাপুর হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক। পেশায় তিনি একজন শিক্ষক এবং তিনি বাম মতাদর্শী মানুষ। বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্য সংস্থায় তাঁর পিতা অমিয় সরকার ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন এবং তিনি অভিনয়ও করতেন। যাত্রা নাটকের পরিবেশের মধ্যে বড়ো হয়েছেন অমিত সরকার, তিনিও এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছেন। তিনি জেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর তৎপরতায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে সরকারী সাহায্য বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্য সংস্থা পেয়েছে।

অজিত মহন্ত (১৯৫৪--)ঃ

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের বর্তমান সম্পাদক অজিত মহন্ত ০৬.০২.১৯৫৪ সালে বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা রমেশ চন্দ্র মহন্ত, মাতা নিভাননী মহন্ত। ১বছর বয়সে তিনি পরিবারের সঙ্গে বালুরঘাটের কোয়ারণে চলে আসেন এবং কোয়ারণেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। নদীপার এন.সি. হাইস্কুল থেকে তিনি উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৭৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। নবম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় তিনি করেন 'রোগীর বন্ধু' নাটকে বন্ধুর ভূমিকায়। তাঁর নাটকের পাঠ গ্রহণ শুরু হয় নাটককার সত্যরঞ্জন তালুকদারের কাছে। সত্যরঞ্জন তালুকদারকে গুরু হিসেবে মানেন। নাট্যমন্দিরে প্রবেশের পূর্বে তিনি বিভিন্ন ক্লাবে নাটক করেছেন। নাট্যমন্দিরে যোগদেন ১৯৭৭ সালে এবং এখানে তাঁর প্রথম নাটক 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণ মন্ডলের ঘর গেরস্তী' বৃন্দাবন ও মতি সাহা চরিত্রে। নাট্যমন্দিরে তাঁর অভিনীত নাটকগুলি হল-'ছেঁড়াতার', 'দানসাগর', 'সাজানো বাগান', 'মারিচ সংবাদ', 'কালাবদর', 'ফাঁস', 'সূর্যশিকার', 'রাজদর্শন', 'বাঘিনী', 'খেলওয়ালা', 'তীর্থযাত্রী', 'গুলশন', 'শাস্তি', 'দর্পনসাক্ষী', 'প্রদোষে প্রভাত' 'অমৃত অতীত', 'দায়বদ্ধ', 'কেউ কথা রাখে না' প্রভৃতি।

অজয় সাহা (১৯৫৪---)ঃ

অজয় সাহা নাট্যমন্দিরের একজন দক্ষ অভিনেতা ছিলেন এবং নাট্যতীর্থ এর

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। নদিয়া জেলার কিচুয়াডাঙ্গা মাতুলালয়ে ১৯৫৪ সালের ১লা মার্চ জন্ম। পিতা যাত্রা শিল্পী জগন্নাথ সাহা, মাতা বিনাপানি দেবী। জে. এল.পি. বিদ্যাচক্রে তিনি সরাসরি পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৭১ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে বালুরঘাট কলেজ থেকে সমাজবিদ্যায় অনার্স নিয়ে স্নাতক হন। ১৯৭১ সাল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অর্গানাইজ করতেন তারপর ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থায়ী হন। বাবা, জ্যাঠামশাই যাত্রা করতেন, বাবা যাত্রার ঢোলক বাজাতেন। পারিবারিক সূত্রেই তিনিই অভিনয়ের প্রেরণা পান। 'রূপোর হরিণ' নাটকে তাঁর প্রথম অভিনয়। ১৯৮০ সালে নাট্যমন্দিরের সদস্য পদ নেন। এখানে তিনি করেন-'কালাবদর', 'কানামামা', 'সাজানোবাগান', 'মাচিরসংবাদ', 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণ মন্ডলের ঘর গেরস্তি'। নাট্যমন্দির থেকে বেড়িয়ে এসে নাট্যতীর্থ (১৯৮২) কয়েকজন মিলে। নাট্যতীর্থের প্রায় সমস্ত নাটকেই তিনি অভিনয় করেছেন। নাট্যতীর্থে তাঁর অভিনীত উল্লেখ যোগ্য নাটক হল-'দানসাগর'(নোনা রায়), 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরান মন্ডলের ঘর গেরস্তী' (মুকুন্দ সর্দার), 'হাজার স্বপন'(বনমালী), 'কানামামা'(যুবক), 'ড.ফস্টাস'(বৃদ্ধ), 'য্যায়সা কা ত্যায়সা'(ড.ঢেলি), 'মধ্যমনি'(টোটো), 'মহাযুদ্ধ'(রামকৃষ্ণ) প্রভৃতি। 'কালাবদর' নাটক দেখার পর নাট্যসমালোচক প্রবোধ বন্ধু অধিকারী বলেছিলেন-''কোচড় থেকে মুড়ি খেতে যার প্রবেশ। সেই শিল্পীর কয়েকটা মিনিটের নির্বাক অভিনয় সব এমফ্যামিস নিজের বগলে পুরে অনায়াসে বেড়িয়ে গেলো। এই শিল্পী জানেন হোয়াট ইজ এ্যাক্টিং এন্ড হোয়াই দিস অ্যাক্টিং।''[৩৪]

বিকাশ কর্মকার (১৯৫৪---)ঃ

নাটকে আলোর কাজ করেন বিকাশ কর্মকার। ৩.৩.১৯৫৪ সালে জন্ম বালুরঘাটে। পিতা ব্রজেন্দ্র নাথ কর্মকার। উচ্চমাধ্যমিক পাশ, করেন। স্কুল জীবন থেকেই সঙ্গে ত্রিতীর্থের সঙ্গে জড়িত। বিভিন্ন প্রযোজনায় ছোটোখাটো ভূমিকায় অভিনয় করলেও মঞ্চের আলোক সম্পাতের কাজে পারদর্শিতা অর্জন করেন। বহুদিন থেকে বহু প্রযোজনায় আলোর কাজ করেছেন অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে।

অরিন্দম চক্রবর্তী (১৯৫৪--)ঃ

বালুরঘাটে ভারতীয় গণনাট্যের বালুরঘাট শাখার প্রতিষ্ঠাতা অরিন্দম চক্রবর্তী। তিনি সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে তোলেন উক্ত শাখা। কোচবিহারে ১৯৫৪ সালের ২৭শে জুন অরিন্দম চক্রবর্তীর জন্ম। পিতা ব্রজেন্দ্র মোহন চক্রবর্তী, মাতা নমিতা দেবী। কোচবিহারের জেনকিন্স হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক, ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ফিজিক্স অনার্স সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে প্রাইভেটে University BT & Evening College থেকে বি.কম. সম্পূর্ণ করেন। ১৯৭৭ সালে কোচবিহার স্কুল বোর্ডে চাকুরী পান। ১৯৮০ সালে পশ্চিম দিনাজপুরে স্কুলবোর্ডে আসেন। এরপর থেকে তিনি বালুরঘাটেই স্থায়ী হয়েছেন। কোচবিহারের 'থিয়েটার ইউনিট' এর প্রযোজনায় ১৯৭৭ সালে পূর্ণাঙ্গ নাটক জোছন দস্তিদারের 'পদ্য-গদ্য প্রবন্ধ' নাটকে তাঁর প্রথম অভিনয়। এরপর তিনি করেন পূর্ণাঙ্গ নাটক 'দানসাগর', 'সাজানো বাগান', একাঙ্ক 'কেননা মানুষ' ও 'শব বাহ এরা'। ভারতীয় গণনাট্যসঙ্ঘের বালুরঘাট শাখায় তিনি করেছেন-'গায়েন','ভূত', 'কংক্রীট', 'খন্ডন','রত্নাকরের রামায়ন' প্রভৃতি।

ধ্রুবজ্যোতি রায় (১৯৫৪--)ঃ

বাপ্পা রায়ের দাদা ধ্রুবজ্যোতি। তাঁরা যমজ সন্তান। ধ্রুবজ্যোতি রায় বালুরঘাট হাইস্কুল থেকে প্রাথমিক ও হায়ারসেকন্ডারী। বালুরঘাট কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক। তূণীরে 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরান মন্ডলের ঘর গেরস্তী' অভিনয়ের পর তিনি ত্রিতীর্থে যোগদেন। ত্রিতীর্থে তিনি বহু নাটকে প্রশংসার সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

বাপ্পা রায়, শুভজ্যোতি রায় (১৯৫৪--)ঃ

বাপ্পা রায় ১৯৫৪ সালে বিহারের কাটিহারে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা শৈলেশ চন্দ্র রায় মাতা ঝর্ণা দেবী। বালুরঘাট হাইস্কুল থেকে প্রাথমিক এবং হায়ারসেকন্ডারী পাশ করেন বেলুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে স্নাতক হন। কর্মজীবনে তিনি ব্যবসায়ী। তাঁর দাদা (যমজ) ধ্রুবজ্যোতি রায় অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি অভিনয় জগতে আসেন। তূণীরে তাঁর প্রথম নাটক। 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণ মন্ডলের ঘর গেরস্তী' (সামসের) এর পর তিনি ১৯৭৭ সালে নাট্যমন্দিরের সদস্যপদ নেন। নাট্যমন্দিরে তিনি করেন 'সাজানো বাগান'(গুপে), 'মারিচ সংবাদ'(মারিচ), 'জুলিয়াস ফুচিক', 'সূর্যশিকার', 'গুলশন' নাট্যমন্দিরে সদস্য থাকা সত্ত্বেও তিনি বর্তমানে অভিনয় করছেন সমবেত নাট্যকর্মীতে।

শ্যামা প্রসাদ তলাপাত্র (১৯৫৪-২০০৮)ঃ

১৯৫৪ সালে বালুরঘাটে জন্ম। পিতা ভবানীপ্রসাদ তলাপাত্র, মাতা জ্যোৎস্না দেবী। বঙ্গী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। আদর্শ হাই স্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করেন। বালুরঘাট কলেজে স্নাতক স্তরে পাঠ গ্রহণ কালে চাকুরীতে প্রবেশ করেন বালুরঘাট পৌরসভায়। বালুরঘাট পৌরসভায় প্রথমে ১বছর শিক্ষকতা করার পর পৌরসভার স্টাফ হন। তারপর Promotion পেয়ে Sanitary inspector হন। তিনি রাজনীতি করতেন কিন্তু তার স্বচ্ছ রাজনীতি বোধ যতটা না তাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় করেছিল, তার থেকে অনেক বেশী আগ্রহী করেছিল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নাট্যচর্চায়। শ্যামাপ্রসাদ তলাপাত্র নাট্য ক্ষেত্রে প্রবেশ নেপথ্যকর্মী হিসেবে। বস্তুত পক্ষে তিনি একজন সত্যিকারের সদর্থক নেপথ্যকর্মী। 'অভিযাত্রী' ক্লাবে স্কুল জীবন থেকেই তিনি প্রম্পট করতেন। প্রকৃত পক্ষে প্রম্পটার হিসেবেই তিনি নাট্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ১৯৭৭ সালে নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করে সেখানেও নেপথ্যকর্মী হিসেবে প্রধান কাজ করেছেন। আবার অভিনয়ও করেছেন। অভিনেতা হিসেবে তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে 'নাট্যতীর্থে' (১৯৮২), নাট্যতীর্থের প্রতিষ্ঠা সদস্য তিনি। নাট্যতীর্থে তিনি করেছেন 'মহাযুদ্ধ (দ্বিতীয় প্রহরী), ড.ফস্টাস'(মেফিস্টোফিলিস) 'কানামামা' (কানামামা), 'দানসাগর'(ঘিসু), 'সাজানো বাগান'(বাঞ্ছারাম), 'কালাবদর' (নিমাই), 'য্যায়সা কি ত্যায়সা' (রসিকমোহন), 'খারিজ','মকবুল'(ডাকাত), 'মধ্যমান' (আনন্দবাবু) প্রভৃতি নাটকে অভিনয় খ্যাতি শুধু জেলাতে নয় বাইরের নাট্যজগতেও পৌঁছে গিয়েছিল। থিয়েটারে দরকার জিতশ্রম, স্থিতধী ও প্রত্যুৎপন্নমতি যেগুলি শ্যামা প্রসাদের মধ্যে ছিল। প্রম্পটারের পূর্ব অভিজ্ঞতার জন্য নাটকে ওনার পার্ট থাক আর নাই থাক গোটা বই থাকত তাঁর কণ্ঠস্থ। আবার তাঁর সামাজিক জীবনও উল্লেখ যোগ্য। তিনি দয়ালু, পরপোকারী, সহানুভূতিশীল ব্যাক্তি। ২০০৮ সালের ১৩ আগষ্ট তিনি পরলোক গমন করেন।

অলোক চৌধুরী, মিলন (১৯৫৫--)ঃ

অভিনয় এবং মঞ্চের কাজে পারদর্শী অলোক চৌধুরী। ডাক নাম মিলন চৌধুরী। ১২.২.১৯৫৫ সালে বালুরঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন।পিতা অমল কান্তি চৌধুরী। ১৯৭৬ সালে 'রূপান্তর' নাট্যগোষ্ঠীতে 'রামের পালা' নাটকে প্রথম অভিনয়। এর পর তিনি ত্রিতীর্থে যোগদান করেন। ত্রিতীর্থে 'দেবাংশী' তাঁর প্রথম নাটক। এখানে তিনি করেন 'বিছন', 'জল', 'চিরকুমারসভা', 'মন্ত্রশক্তি', 'দেবীগর্জন', ও 'ঠাকুরদা'। অভিনয় ছাড়াও থিয়েটারের যাবতীয় কাজের প্রতি তাঁর সমান আগ্রহ। মঞ্চ নির্মাণ, রিকুইজিশন, সরবরাহর পোষাক পরিষদ ইত্যাদির ব্যাপারে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন।

সুব্রত মজুমদার(১৯৫৫---)ঃ

অভিনেতা, পরিচালক সাধন মজুমদারের ভাই সুব্রত মজুমদার। ৩.৮.১৯৫৫ সালে বালুরঘাটে জন্ম। পিতা ভবগোপাল মজুমদার, মাতা অনিলা দেবী। বালুরঘাট কলেজ থেকে বি.কম. পাশ। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে বালুরঘাট শাখায় চাকরী করতেন। ১৯৮৫ সালে চাকুরী সূত্রে কলকাতায় চলে যান। নাট্যমন্দিরে বেশ কতকগুলি নাটকে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'জীবনদর্পন','সাজানো বাগান', 'মারিচ সংবাদ' প্রভৃতি। নাটকে নেপথ্যের কাজও করতেন।

জয়ন্ত চক্রবর্তী (১৯৫৫---)ঃ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার জামালপুর গ্রামে ১৯৫৫ সালের ১২ই নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা হেমন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, মা যুথিকারাণী দেবী। প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ জামালপুর গ্রামে, ললিত মোহন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৭৪ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। বালুরঘাট কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক হন ১৯৭৭ সালে। ১৯৮২ সালে স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্মজীবন শুরু। তিনি বিভিন্ন নাটকে ছোট খাট পাঠ করেছেন কিন্তু নাট্যমঞ্চের আনুষঙ্গিক কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। গেটে থাকা, টিকিট কাউন্টারে থাকা কখনো বা দর্শকাসন দেখিয়ে দেওয়া প্রভৃতি কাজ গুলি করতে ভালো বাসতেন।

সমরেন্দ্র সরকার (১৯৫৭--)ঃ

সমরেন্দ্র সরকার ১৩.০৭.১৯৫৭ সালে বালুরঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম শ্রেণী মনিমালা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পাঠগ্রহণ করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বালুরঘাট উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং এখানে থেকেই উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। বালুরঘাট কলেজ থেকে স্নাতক হন। ১৯৯১ সালে চোপড়া ব্লকে গ্রাম সেবক পদে নিযুক্ত হন। কালি মজুমদারের হাত ধরে তাঁর প্রথম নাটক- 'রক্তে রোয়া ধান' আমবাগানের পক্ষথেকে নাট্যমন্দিরে মঞ্চস্থ হয়। 'আত্রেয়ী'(১৯৭৮) নাট্যগোষ্ঠীতে করেছেন 'কেনারাম বেচারাম', 'নরক গোলজার'। 'নরক গোলজার' তাঁর প্রথম পরিচালিত নাটক। সমরেন্দ্র সরকার এবং আরো কয়েকজন নাট্যামোদী গড়ে তোলেন 'পদাতিক'(১৯৮৫) নাট্যসংস্থা। এখানে তিনি অভিনয় ও পরিচালনা করেন 'গাব্বু খেলা' 'যোগিনী যখন যজ্ঞেশ্বর' এরপর তিনি পদাতিক থেকে গণনাট্যের বালুরঘাট শাখায় যোগদেন। সেখানে তিনি করেন-'ভূত','কংক্রিট', 'অরাজনৈতিক', 'ক্রীতদাস', 'খন্ডন', 'চাঁদনি রাতে', 'পাঁকে বিপাকে', 'মহাবিদ্যা', 'রত্নাকরের রামায়ন','পালক',

'মৃত্যুঅতীত'। গণনাট্যে অভিনয় চলাকালীন তিনি ত্রিতীর্থে করেছেন 'তিনবিজ্ঞানী','অসমাপিতা','দেবাংশী'। 'ওরণী' নামে একটি নাট্যসংস্থা গঠন করেন সেখানে তিনি অভিনয় ও পরিচালনা করেন 'ঠাকুরদা', 'দরদাসের গল্প', 'মেহেরজান', 'বিসর্জন'(সংক্ষিপ্ত), 'মহাবিদ্যা'। বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে অরূপ ভট্টাচার্যের সম্পাদনা কালে অনুষ্ঠিত 'উত্তরবঙ্গ উৎসব' 'পথ বেঁধে দিল' নাটকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান।

প্রশান্ত সরকার (১৯৫৭---)ঃ

আলোক শিল্পী প্রশান্ত সরকার ১৯৫৭ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর বালুরঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা প্রমথ নাথ সরকার। চাকুরীজীবি। ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার আলোক শিল্পী তিনি। ১৯৮০ সালে ত্রিতীর্থে প্রবেশ করেন থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে অভিনয়ের দিকে আকাঙ্খিত না করে নেপথ্য কর্মকান্ডের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। স্বশিক্ষিত এই মানুষটির নিখুঁত সময়-জ্ঞান আলোকসম্পাতের কাজে তাকে সাফল্য দিয়েছে ত্রিতীর্থ- প্রযোজনাগুলির মধ্যে 'গ্যালিলেও', 'দেবাংশী', 'বিছন', 'চিরকুমারসভা','মন্ত্রশক্তি','অনিকেত', 'অর্থম অনর্থম','বোধোদয়', নবপর্যায়ে 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'দেবীগর্জন', 'জল', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' প্রভৃতিতে তাঁর আলোক সম্পাত প্রশংসিত।

রবীন্দ্রনাথ সাহা (১৯৫৮---)ঃ

উত্তরবঙ্গে প্রথম অনুনাটকের সূচনা করেন 'বালুরঘাট সৃজন' নাট্যগোষ্ঠীর ব্যানারে রবীন্দ্রনাথ সাহা। ১লা জানুয়ারী ১৯৫৮ সালে হিলিতে জন্ম। পিতা ব্রজেশ্বর সাহা, মাতা ইন্দুবালা সাহা। পেশায় তিনি একজন শিক্ষক। হিলির 'যুবগোষ্ঠী'(১৯৬৮) নাট্যসংস্থাতে তাঁর প্রথম নাটকে হাতে খড়ি। তাঁর প্রথম নাটক 'ছুটির ফাঁদে'। 'বিলাসী' 'কিন্তু নাটক নয়', 'মারিচ সংবাদ', 'মেষ ও রাক্ষস হইতে সাবধান', 'কাকচরিত্র' ইত্যাদি তাঁর অভিনীত নাটক। ১৯৮৫ সাল থেকে তিনি যুবগোষ্ঠীতে নাট্যপরিচালনার কাজ করতেন। 'মহেশ', 'কাকচরিত্র', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'কাবুলিওয়ালা' সহ প্রায় ১৭-১৮টি নাটকের পরিচালনা করেন। ২০০২ সালে তিনি ত্রিতীর্থে যোগদান করেন। সেখানে দেড় বছরে দুটি নাটকে অভিনয় করেন। 'দেবাংশী' ও ' উত্তরণ', ২০০৮ সালে তিনি নিজেই 'বালুরঘাট সৃজন' নামে একটি নাট্যসংস্থা তৈরি করেন। 'অনুনাটক' দিয়ে সৃজনের পথ চলা শুরু হয়। প্রতিবছর সৃজন অনুনাটক উৎসব করে থাকে।

চন্দন দাস (১৯৫৮---)ঃ

চন্দন দাস নিমাই বলে সমধিক পরিচিত। ১৯৫৮ সালের ২৪শে জানুয়ারী বালুরঘাটে জন্ম। পিতা ধীরেন্দ্র নাথ দাস, মাতা সরোজিনী দেবী। গৌরী রাণী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ। খাদিমপুর হাইস্কুল থেকে ১৯৭৫ সালে হায়ারসেকেন্ডারী পাশ করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তি যুদ্ধের সময় শরণার্থীদের সাহায্যের মধ্য দিয়ে তিনি বামপন্থীর সঙ্গে যুক্ত হন। মাষ্টার মশাই অশ্বিনী কুমার ধরের নেতৃত্বেই তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তিনি একসময় প্রচুর প্রাইভেট পড়াতেন, প্রাইভেট পড়াতে তিনি ভালোবাসতেন। পাঞ্জাবী, পাজামা পরে টর্চ হাতে নিয়ে চলা ফেরা করতেন। ১৯৯১ সালে ব্লক অফিসে গ্রাম সেবক হিসেবে প্রবেশ করেন। বর্তমানে তিনি নির্বাহী সহায়ক।

বড় দাদা প্রণয় দাস নাটকের নেপথ্য কর্মী ছিলেন। অপর দাদা মিলন দাসও নাটক করতেন। পাড়াতেই তাঁর প্রথম নাটক। ১৯৭৬ সালে খাদিমপুর হাইস্কুলের সিলভার জুবিলী অনুষ্ঠানে দীপক রক্ষিত এর পরিচালনায় 'চৌদ্দপাঁকে বাঁধা' (বেলিক) অভিনয় করেন। 'রূপান্তর' নাট্য সংস্থায় করেন 'ইতিহাস কাঁদে', 'জিওদ্রানোর্বুনো', 'অরুণোদয়ের পথে', 'বিবসনাবৃহনলা', 'কালামাটির কান্না'। 'রূপান্তরে' থাকাকালীনই ১৯৮২ সালে বিধান সভা নির্বাচনের প্রাক্-কালে হারাণ মজুমদার, প্রশান্ত মৈত্র, গৌর সাহা, অরিন্দম চক্রবর্তী, সমরেন্দ্র সরকার ও তিনি মিলে 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘর বালুরঘাট শাখা' প্রতিষ্ঠা করেন। পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দেবেশ গোস্বামী ও নির্মলেন্দু তালুকদার। এখানে তিনি ২০০৯ সাল পর্যন্ত অভিনয় করেছেন। বর্তমানে IPTA বালুরঘাট শাখার কাজকর্ম স্থিমিত হয়ে পড়েছে ফলে এখন আর তিনি অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত নন।

বন্দনা মজুমদার (১৯৫৮---)ঃ

৩১.০১.১৯৫৮ সালে বালুরঘাটের চকভৃগুতে জন্ম। পিতা তিনকড়ি চক্রবর্তী, মাতা পুষ্প দেবী। S.S.K. তে কর্মরতা বন্দনা মজুমদার। ১৯৭৫ সালে রণজিৎ কিশোর মজুমদার (পল্টন) এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। গৃহবধু কিন্তু গার্হস্থ্য তাঁকে ঘরবন্দী করতে পারেনি। শিল্প তৃষ্ণা সৃষ্টি বাসনা ছিল তার মনে। তাই দেখা যায় মঞ্চকে উদ্ভাসিত করেছেন অতিচেনা অথচ অচেনা সার্থক চরিত্র রূপায়নে। তাঁর শাশুড়ী পাড়ায় বেশ কতকগুলি নাটকে অভিনয় করেছেন। বৌমাকেও তিনি অভিনয় করতে প্রেরণা দিতেন। শশুড় বাড়ির কোনো বাধা ছিল না অভিনয় করতে। তাঁর প্রথম অভিনয় 'দেবাংশী' নাটকে মোক্ষদার চরিত্রে, 'মন্ত্রশক্তি'(চোরের বৌ), 'অসমাপিকা', 'জল' প্রভৃতি। তিনি ১৯৮৪ সাল থেকে এখনো ত্রিতীর্থের সঙ্গে জড়িত।

আশিষ সরকার (১৯৫৮---)ঃ

আশিষ সরকার অভিনেতা নন কিন্তু তিনি নাট্যশিল্পের সঙ্গে অতোপ্রোতোভাবে জড়িত। মঞ্চের পেছনে যে সমস্ত কাজকর্ম থাকে যা সুষ্ঠ ও পরিকল্পিত ভাবে সম্পাদন না হলে নাটক মঞ্চস্থ হতে পারে না। সেই কর্মের কর্মী হলেন আশিস সরকার। বাকুড়া জেলার লোদনা গ্রামে ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ সালে জন্ম। পিতা হরেন্দ্র নাথ সরকার, মাতা নীহার বালা দেবী। শৈশব থেকেই তিনি দু:খের অংশীদার। ৫বছর বয়সে মা মারা যাওয়ার পর মামার কাছে প্রতিপালিত হয়েছেন। আবার ১২ বছর বয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর দাদার কাছে থেকেছেন। তিনি প্রাথমিক পড়েছেন মধ্যপ্রদেশের কোরবা, মাধ্যমিক পুরুলিয়ার কাশিপুর, স্নাতক হয়েছেন বহরমপুর কলেজ থেকে। বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানীতে কাজ করেছেন। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে পি.ডব্লু.ডি. তে চাকরী পেয়ে বালুরঘাটে আসেন। বালুরঘাটে এসে নাট্যপ্রিয় ব্যাক্তি বালুরঘাটের নাট্য জগতে জড়িয়ে পরেন। মঞ্চ অভিনয় না করলেও নেপথ্য কর্মী হিসেবে তিনি এমন কোনো কাজ নেই যে করেন নি।

শিবপ্রসাদ মন্ডল (১৯৫৯---)ঃ

১৬ই জানুয়ারী ১৯৫৯ বালুরঘাটে শিবপ্রসাদ মন্ডলের জন্ম। পিতা সত্যলোচন মন্ডল, মাতা কণিকা দেবী। বানিজ্য বিভাগে স্নাতক। তাঁর ঔষুধের ব্যবসা রয়েছে। ১৬বছর বয়সে

বিবেকানন্দপল্লী পাঠাগারের প্রযোজনায় 'অশান্ত পৃথিবীতে' প্রথম অভিনয় করেন। এরপর করেছেন 'ডাকঘর', 'অনশনভঙ্গ'। নাট্যমন্দিরে প্রবেশের পূর্বে করেছে নিজের লেখা নাটক 'শিল্পীর প্রতি শিল্প' ও 'শপথ'- নাটক দুটি নাট্যমন্দির মঞ্চে মঞ্চস্থ করেছেন। পরিচালক, আলো, মঞ্চ সবই তিনি নিজে করেছেন। 'প্রগতি' নাট্য সংস্থায় করেছেন 'ভূতের মুখে রামনাম', 'আজও প্রমিথিউজ', 'দধিচীমন', 'গরমভাত', 'কিনু কাহারের থেটার'। সিভিল ডিফেন্সে জড়িত থাকার সময়ও তিনি তিনটি নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৮৪ সালে তিনি নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করেন এবং সেখানে তিনি করেন-'প্রস্তুতি', 'বাঘিনী','গুলশন' প্রভৃতি।

জগৎ রঞ্জন পাল (১৯৫৯---)ঃ

জগৎ রঞ্জন পাল ১৯৫৯ সালের ১৮ই জানুয়ারী বালুরঘাটে জন্ম। পিতা নিত্যানন্দ পাল স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। মাতা বিনিতা রাণী দেবী। প্রাথমিক থেকে হায়ার সেকেন্ডারী বালুরঘাট হাইস্কুল, বি.কম. বালুরঘাট কলেজ থেকে ১৯৮২ সালে সম্পূর্ণ করেন। কর্মজীবনে তিনি মোহরী। কয়েকজন বন্ধু মিলে 'প্রগতি' নাট্য সংস্থা এবং সেখানেই তিনি অভিনয় করতেন। তাঁর প্রথম নাটক 'দধিচীমন' (গ্রামবাসী)। 'স্ফিংস' (বিনাশ), 'নৈশভোজ'(চক্রুধর কুন্ডু), 'কমরেডস হাত নামান'(রণদ্বীপ সান্যাল), 'আজও প্রমিথিউস'(চুরকা মুর্মু), 'বর্ধমানের বর বরিশালের কনে' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেন।

নিমাই দে (১৯৫৯--)ঃ

আলোক শিল্পী নিমাই দে ১৯৫৯ সালে বালুরঘাটের হালিপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সতীশ চন্দ্র দে, মাতা রাধারানী দেবী। কালিকাপুর হাইস্কুল থেকে অষ্টমশ্রেণী পাশ। তিনি লাইটের ব্যবসা করতেন। ১৯৯২ সাল থেকে পৌরসভার কাজ শুরু করেন। তিনি নাট্যমন্দিরে আলো দিয়েছেন 'সমুদ্র সন্ধানে', 'ছেঁড়াতার', 'ঝুমুর', 'নয়ন কবিরের পালা', 'নীলদর্পন', 'অরণোদয়ের পথে', 'জুলিয়াস ফচিক'। আটের দশকের অভিনীত সমস্ত নাটকে ('খেলাওয়াল', 'প্রদোষে প্রভাত', 'ভূ-ভার কর্পোরেশন'বাদে) তিনি আলো দিয়েছেন। নাট্যমন্দির ছাড়াও তিনি বালুরঘাটের সমস্ত নাট্যসংস্থাতেই নাটকে আলো দিয়েছেন। নাটকে আলোর ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর ব্যবহারিক মন্তব্য গ্রহণ যোগ্য ''পরিচালকের নির্দেশ ছাড়াও লাইট ম্যান, মিউজিক ম্যান এর স্বাধীনতা থাকতে হবে।''[৩৫]

দুর্গাপদ সান্যাল (১৯৬০---)ঃ

দুর্গাপদ সান্যাল ১৮/০১/১৯৬০ সালে বালুরঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা শ্যামাপদ সান্যাল, মাতা মীরা সান্যাল। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত বালুরঘাট হাইস্কুলে পড়াশোনা করেন। বালুরঘাট কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক ও গ্রাজুয়েশন সম্পূর্ণ করেন। ১৯৮৪ সালে তিনি ক্ষুদ্র জলসেচ নিগমে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৭ বছর বয়সে পাড়াতেই তিনি প্রথম নাটক করেন-'বহ্নি পুরের রক্ত বহ্নি'। প্রগতি নাট্যসংস্থার প্রযোজিত সমস্ত নাটকের পরিচালনা করেন, অভিনয়তো বটেই। তাঁর পরিচালনা ক্ষমতা অসীম। প্রগতি নাট্যসংস্থায় তিনি 'বহ্নিপুরের রক্ত বহ্নি'(গ্রামের কৃষক), 'দধিচীমন' (চার্চের ফাদার), 'আজও প্রমিথিউস' (জুলিয়াস সিজার), 'কমরেডস হাত নামান' (মূল পরিচালক) 'স্ফিংস' (অক্ষয়), গরম ভাত (বাবা), 'ভূতের মুখে রাম নাম', 'নৈশভোজ (চামার), 'কিনু কাহারের থেটার' (মিলটন

সাহেব), 'একটি মন দুটি মন' (নায়ক), প্রধান চরিত্র প্রগতি নাট্যসংস্থা লুপ্ত হবার পর তিনি রায়গঞ্জে চাকুরী সূত্রে থাকা কালীন 'তরুণ নাট্য সংস্থা' এ নাটক করেছেন, অভিনয় ও পরিচালনা উভয়ই তরুণ নাট্য সমাজে পরিচালনা করেছেন 'তাহার নামটি রঞ্জনা', 'সমবেত সওয়াল জবাব', 'পরবাস', নৈশভোজ', 'গরমভাত'। ২০০০ সালের পরে কিছুদিন তিনি অভিনয় থেকে বিরত থাকেন কিন্তু বর্তমানে আবার তিনি পূর্ণ উদ্যোমে নাটক করছেন।

মনোতোষ সাহা (১৯৬১--)ঃ

১৯৬১ সালের ১লা জানুয়ারী বালুরঘাটে জন্ম। পিতা রঘুনাথ সাহা, মাতা স্নেহলতা দেবী। প্রাচ্যভারতী বিদ্যাপীঠ থেকে মাধ্যমিক (১৯৭৯), বালুরঘাট কলেজ থেকে বি.কম.(১৯৮৩)। তিনি মোহরীর কাজ করেন। কয়েকজন বেকার বন্ধু একসঙ্গে থাকতেন, তেমন কাজ কর্ম ছিল না। তাঁরাই একসঙ্গে অভিনয়ের জগতে প্রবেশ করেন। তিনি 'প্রগতি' নাট্য সংস্থার প্রায় সমস্ত নাটকে অভিনয় করেছেন। 'ভূতের মুখে রাম নাম', (বাড়িওয়ালা), 'আজও প্রমিথিউজ',(সিজার), 'গরমভাত', 'নৈশভোজ'(নেতা), 'স্ফিংস'(ইডিপাম), 'ছাগল' প্রভৃতি। ভালো অভিনেতা ছিলেন কিন্তু অভাব তাঁর প্রতিভা নষ্ট করে দিয়েছে। কালেক্টরেট এ মোহরীর কাজ করে তাঁর দিন কাটে। 'প্রগতি' বিলুপ্ত হবার পর তিনি আর কোথাও অভিনয় করেননি।

রুমা নন্দী (১৯৬১---)ঃ

দিশারী পুরস্কার প্রাপ্ত বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী রুমা নন্দী ১৯৬১ সালে (১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ২৮শে শ্রাবণ,) শিলিগুড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহেন্দ্র নারায়ণ নন্দী, মাতা গীতা দেবী। শিলিগুড়ি থেকে স্কুল পাঠ গ্রহণ করেন এবং শিলিগুড়ি কলেজ থেকে বি.এ. প্রথম বর্ষ পর্যন্ত পড়াশোনা করে বালুরঘাট কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। পিতার কর্মসূত্রে তিনি ১৯৭৯ সালে বালুরঘাটে আসেন এবং ১৯৮২ সালে নাট্যমন্দিরের সদস্যপদ নেন। রুমা নন্দীর অভিনয় প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তিনি অল্প সময়ে নাট্যমন্দিরের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিনয় 'জীবনদর্পন', 'অমৃতঅতীত', 'কালাবদর', 'তাহার নামটি রঞ্জনা', 'গুলশন', প্রভৃতি। ১৯৮৬ সালে 'বাঘিনী' তাঁর শেষ নাটক। ১৯৮৭ সালে বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি আর নাটক করেননি। 'কালাবদর' নাটকে 'দুর্গা' চরিত্রে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য তিনটি পুরস্কার পান।

CCI- ১৯৮৩
ISCLO -(বেনারস) ১৯৮৩
দিশারী -(উত্তরবঙ্গ) ২০০৫
বর্তমানে কলকাতায় আছেন। নাটকের সঙ্গে জড়িত।

প্রমীলা সরকার (১৯৬২---)ঃ

১৯৬২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা ধীরেন্দ্র নাথ সরকার, মাতা চানুবালা দেবী। প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ মালদা মোকদমপুর পাঠাশালায়। মাধ্যমিক মালদা গার্লস (১৯৭৮)। স্নাতক বিজ্ঞান বিভাগে বালুরঘাট কলেজ থেকে। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই বাম

মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। কলেজে তিনি SFI করতেন। তিনি স্কুল শিক্ষক। কলেজে পড়াশোনার সময় থেকেই নাটক করতেন। অভিনেতা জীবন কানাই মুখোপাধ্যায় ত্রিতীর্থ নাট্য সংস্থাতে নিয়ে যান। একদিন সন্ধ্যাবেলায় হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ত্রিতীর্থ নাট্য সংস্থায় তিনি করেছেন-'তিন বিজ্ঞানী', 'দেবাংশী', 'জল', 'দেবীগর্জন', ও 'চিরকুমারসভা'। ত্রিতীর্থে অভিনয় করাকালীন ত্রিতীর্থের পারমিশন নিয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংস্থার বালুরঘাট শাখায় অভিনয় করেন। এখানে তিনি করেন 'কংক্রিট'।

প্রণয় মহন্ত (১৯৬২---)ঃ

২৫.১২.১৯৬২ তারিখে বালুরঘাটে প্রণয় মহন্তের জন্ম। পিতা বিনয় কুমার মহন্ত। প্রণয় কুমার স্নাতক। স্থায়ী পেশা তেমন কিছু নেই। ত্রিতীর্থ প্রবেশ করেন ১৯৮৮ সালে। ছোট ছোট চরিত্রে অভিনয় করলেও প্রধানত নাটকের বাইরের কাজ করে দায়িত্বশীল থিয়েটার কর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মঞ্চ নির্মাণে যথেষ্ট পারদর্শী। তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তিও উল্লেখযোগ্য। 'চিরকুমার সভা', 'মন্ত্রশক্তি', 'বোধোদয়', 'অর্থম অনর্থম', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'অনিকেত' ইত্যাদী নাট্য প্রযোজনার মঞ্চ নির্মাণের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন।

সুশান্ত সান্যাল (১৯৬৩---)ঃ

১.০১.১৯৬৩ তারিখে বালুরঘাটে জন্ম সুশান্ত সান্যালের। পিতা সুনীল সান্যাল, মাতা ছন্দা দেবী। বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক, ম্যাট্রিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। বালুরঘাট কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন বাংলা বিষয়ে অনার্স সহকারে। প্রথমে তিনি কোম্পানীতে চাকুরী করতেন, বর্তমানে তিনি ব্যবসা করেন। ১৬-১৭ বছর বয়সে তাঁর প্রথম অভিনয় পাড়ার মুক্তমঞ্চে 'কু সঙ্গই নষ্টের মূল' (এক যুবক) নাটকে। 'প্রগতি' নাট্যসংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। প্রগতির প্রযোজিত প্রায় সমস্ত নাটকেই অভিনয় করেছেন। 'বহ্নিপুরের রক্ত বহ্নি' (প্রদ্যুৎ), 'বেকারের স্বপ্ন'(বেকার যুবক), 'আজও প্রমিথিউস' (যাদুকর), 'কমরেডস হাত নামান'(তিনি চারটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন), 'সমবেত সাওয়াল জবাব' (পুলিশ), 'স্ফিংস'(প্রভাত), 'গরম ভাত'(পাগলা ছেলে), 'বর্ধমানের বর বরিশালের কনে'(বর্ধমানের বর), 'ছাগল' (রাজনৈতিক নেতা), 'কিনু কাহারের থেটার',(রাজা), 'ভূতের মুখে রামনাম'(যদু), 'দধিচীমন' (কামাল)। ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ দিনাজপুরে কবিতীর্থ ক্লাব আয়োজিত 'একাঙ্ক নাটক' প্রতিযোগিতায় 'কমরেডস্ হাত নামান' নাটকে শ্রেষ্ঠ্য অভিনেতার পুরস্কার পান তিনি। তিনি নাটকের সঙ্গে বালুরঘাটের কালি মজুমদারের যাত্রাদলে যাত্রা করেছেন। 'বিয়াল্লিশের বিপ্লব'(বিপ্লবী), 'মহাতীর্থকালীঘাট'(জগাসর্দার), 'মা-মাটি-মানুষ'(প্রতিবাদী কামাল)। বর্তমানে তিনি ব্যারাকপুরে থাকেন। টি.ভি. চ্যানেলের সিরিয়াল করেন।

প্রণব চক্রবর্তী (১৯৬৩--)ঃ

পুরোহিত প্রণব চক্রবর্তী ১৯৬৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী বালুরঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা প্রকাশ নাথ চক্রবর্তী, মাতা বিনয় রাণী দেবী। বালুরঘাট নদীপার এন.সি. হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং বালুরঘাট কলেজ থেকে স্নাতক। ১২ বছর বয়সে নদীপার এন.সি.

হাইস্কুলের সিলভার জুবিলীতে সত্যরঞ্জন তালুকদারের তত্ত্বাবধানে এবং তাঁরই লেখা একটা ঐতিহাসিক কাহিনীতে (হিউয়েনসং এর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। চকভৃগু 'জীবনমরণ' সঙ্ঘের প্রযোজনায় নাটক করেছেন। ১৯৮০ বালুরঘাট কলেজে পড়াশোনা কালীন বন্ধু সুশান্ত সান্যালের প্রেরণাতে একটি প্রতিষ্ঠিত নাট্য সংস্থা 'প্রগতি'তে যুক্ত হন। সেখানে তিনি নিয়মিত নাটক করতেন। প্রগতিতে তাঁর প্রথম নাটক 'কমরেডস হাত নামান' (পুলিশ)। প্রগতিতে ১৯৮০-১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রায় সমস্ত নাটকেই অভিনয় করেছেন। 'কিনু কাহারের থেটার'(কিনু), 'গরমভাত'(ছেলে), 'স্ফিংস'(সৈনিক), 'বর্ধমানের বর বরিশালের কনে'(বর্ধমানের পরিবারের কর্তা), 'ছাগল'(নেতা), 'ভূতের মুখে রাম নাম'(প্রতিবেশী), 'সমবেত সওয়াল জবাব' (নেতার চ্যালা), 'কাক'(গৃহকর্তা) প্রভৃতি। 'নৈশভোজ' নাটকে ঠ্যাঙ্গা চৌকিদারের ভূমিকায় রায়গঞ্জ দেহশ্রী ব্যামাগারে ১৯৮৪ সালে নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত হন। নদীপার এন.সি. উচ্চ বিদ্যালয়ে গোল্ডেন জুবলী অনুষ্ঠানে তিনটি নাটকে (টেলিভিশন, উদ্বাস্তু, সাক্ষরতা দূরীকরণ) অভিনয় করেন। এছাড়াও তিনি যাত্রাপালাতেও অভিনয় করেছেন।

যিষ্ণু নিয়োগী (১৯৬৩--)ঃ

১৯৬৩ সালে ২৩শে এপ্রিল বগুড়ার আদমদিঘিতে জন্ম। পিতা সুশীল নিয়োগী, মাতা সুভা দেবী। তাঁর ঠাকুরদাদা বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সতীশ নিয়োগী। বিশ্বনাথ রাও এর ছাত্র ছিলেন। বিশ্বনাথ রাও তাঁর একটি তানপুরা সতীশ নিয়োগীকে দিয়েছিলেন। পিতা সুশীল নিয়োগী ছিলেন সাহিত্যিক। যশোর সাহিত্য সঙ্ঘের দ্বারা পুরস্কৃত হয় সুশীল নিয়োগী। তাঁর ঠাকুরমাতা প্রতিভা নিয়োগী ছিলেন প্রতিভাময়ী তিনি কবিতা লিখতেন এমন একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান যিষ্ণু নিয়োগী। তিনি সুকণ্ঠের অধিকারী এবং অভিনয়ে নিপুণ। আট বছর বয়সে তিনি পরিবারের সঙ্গে বালুরঘাটে চলে আসেন। বালুরঘাট হাইস্কুল থেকে প্রাথমিক ও হায়ারসেকেন্ডারী পাশ করেন। প্রাইমারী কাউন্সিলে কর্মরত। তাঁর প্রথম অভিনয় 'রূপান্তর' নাট্যগোষ্ঠীতে একটি ছোট নাটকে। কিন্তু প্রকৃত অভিনয় তাঁর শুরু হয় 'পাকাল' নাটক থেকে। 'একা একা'(সেক্রেটারী), 'গোধূলী বেলায়'(সাহিত্যিক) প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছেন। শুভ্রাংশু শেখর মিত্র এর লেখা 'পদ্মাবতীকথা' নাটকে সাত-আটটি গান রচনা করেন যিষ্ণু নিয়োগী। আর সুর দিয়েছিলেন ভবেন্দু ভট্টাচার্য।

জ্যোতিশঙ্কর চক্রবর্তী (১৯৬৪--)ঃ

জ্যোতিশঙ্কর চক্রবর্তী মোহর নামেই পরিচিত। ১৯৬৪ সলর ১১ই নভেম্বর বালুরঘাটে জন্ম। পেশা শিক্ষকতা। ছাত্রাবস্থায় স্কুল কলেজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকতেন সেই সূত্র ধরেই তিনি অভিনয়ে এসেছেন। ১৯৭৮ সালে তাঁর প্রথম নাটক 'ভোট দেবেন কাকে', কালিবাড়ি স্পোর্টিং ক্লাবের প্রযোজনায় ও সুনীল খাঁর নির্দেশনায়। ১৯৮৮ তূণীরে যোগদেন। এখানে তিনি প্রদোষ মিত্রের নির্দেশনায় 'একা একা' নাটকে মিষ্টার সিন্‌হা চরিত্রে অভিনয় করেন। তূণীরে করেন 'শেষরক্ষী', 'গোধূলী বেলায়'(পার্শ্বচরিত্র), 'সন্ন্যস্ত'(জামাইবাবু), 'পদ্মাবতী কথা'(শিব)। এছাড়াও তিনি টি.ভি. সিরিয়াল তারা বাংলায় 'বড় একা লাগে'(দোকানের কর্মচারী)। চলচিত্রে সমরেশ বসুর লেখা গৌতম ঘোষের 'কালবেলা' তে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন।

মানসী ভৌমিক (১৯৬৫--)ঃ

অভিনেতা যতীন্দ্র নাথ ভৌমিক এর কন্যা মানসী ভৌমিক ১৮.১১.১৯৬৫ সালে বালুরঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। মাধ্যমিক পাশ। স্বামী আশিস বসাক। তাঁর প্রথম নাটক 'ডাকঘর' সপ্তম শ্রেণীতে পড়বার সময়। পিতা নাট্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। পাড়ার নাটকে অভিনয় করতে মেয়েকে উৎসাহ দিতেন। তাঁরই আগ্রহে 'ভাঙ্গাপট' নাটকে একটি ছোট চরিত্রে অভিনয় সূত্রে ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থায় প্রবেশ। তারপর 'দেবীগর্জন', 'জল', 'গ্যালিলেও', 'দেবাংশী', 'বিছন', 'মন্ত্রশক্তি', প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে নিজেকে একজন দক্ষ অভিনেত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। সাংসারিক কারণে এখন আর তিনি অভিনয় করছেন না।

প্রাণতোষ ভট্টাচার্য (১৯৬৬----)ঃ

১৯৬৬ সালের ৩রা জানুয়ারী অভিনেতা প্রাণতোষ ভট্টাচার্যের জন্ম। পিতা ভবতোষ ভট্টাচার্য, মাতা সুনীতি দেবী। কবিতীর্থ বিদ্যানিকেতন থেকে প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করার পর বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৮৪ সালে হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করেন। তিনি ক্যাটারিং এর ব্যবসা করেন। সাতের দশকের অভিনেতা নাটকের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত। তূণীরে 'পাকাল' নাটক তাঁর প্রথম অভিনীত নাটক। তূণীর প্রযোজিত সমস্ত নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। তূণীর ত্যাগ করে তিনি বালুরঘাট নাট্য কর্মীতে প্রবেশ করেন এখানে তিনি 'ঝুমুর', 'দ্য জাষ্ট' নাটক অভিনয় করেন। বর্তমানে তিনি 'সমমন'(২০১৫) নাট্য সংস্থায় নাটক করছেন।

নিলীমা সাহা (১৯৬৭---)ঃ

১৯৬৭ সালের ৮ই ডিসেম্বর বালুরঘাটের প্রাচ্য ভারতী পাড়ায় জন্ম। পিতা গৌর চন্দ্র সাহা, মাতা জ্যোৎস্না রাণী দেবী। প্রাচ্যভারতী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা, খাদিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক, বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাশ করেন। ১৯৯১ সালে মার্চে নিতাই সরকারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি N.G.O. তে কাজ করেন। পরিবারেই যাত্রা নাটকের পরিবেশ ছিল। বাবা যাত্রা করতেন। কাকা নাটক করতেন। স্বাভাবিক ভাবেই শৈশব থেকেই তিনি অভিনয় শিল্পের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। ক্লাস সেভেনে যখন তিনি পড়েন তখন পাড়াতে তিনি করেছেন 'বড় বৌ', 'অভাগীর মেয়ে', 'বৌদি'। একাদশ শ্রেণীতে পাঠকালে তিনি ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের বালুরঘাট শাখা 'কংক্রীট' নাটকে স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯৮৬ সালে 'অরাজনৈতিক' নাটকে অভিনয় করেন গণনাট্যের পক্ষ থেকে।

বিয়ের পর শ্বশুড় বাড়ির অসহযোগিতায় তিনি সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। তবে তাঁর স্বামী তাঁকে কখনো বাধা দেননি। ২০০৫ সালে নাট্যকর্মীর আহ্বানে সেখানে তিনি 'আলকায়দা'তে (নায়িকা) অভিনয় করেছেন। 'শোকমিছিল', 'ফিরে পাওয়া'(পথনাটক) করেছেন।

পার্থ দাস (১৯৭০---)ঃ

বালুরঘাট নালন্দা বিদ্যাপীঠের শিক্ষক পার্থ দাস, ১৯৭০ সালের ১৫ই মার্চ বালুরঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা শ্রীপদ দাস, মাতা রেণুকা দেবী। প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক

পর্যন্ত খাদিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়, বালুরাট কলেজ থেকে ১৯৯২ সালে অর্থনীতিতে স্নাতক। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৪ সালে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় 'অগ্নীবীনা' নাট্যসংস্থার 'মৃত্যজনে প্রাণ' নাটকে একটি ছোটো পাঠে অভিনয় করেন। 'রথের রশ্মি, 'আগুন', 'দেওয়া নেওয়া' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৮৮ সালের পর 'অগ্নিবীণা' বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮৯ সালের দিকে তিনি প্রগতি নাট্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন। এখানে তিনি করেন 'কিনু কাহারের থেটার', 'ছাগল'। ১৯৯৫ সালে 'দর্পণ' এ করেন 'পদধ্বনি'। রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা নাটকটি অধিক জনপ্রিয় হয়েছিল। বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী পার্থ দাস ১৯৯৮ সালে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের বালুরঘাট শাখায় যোগদেন। ১৯৯৮ -২০১৩ সাল পর্যন্ত গণনাট্যে অভিনয় করেছেন। এখানে তিনি করেন 'মহাবিদ্যা', 'রত্নাকরের রামায়ণ', 'পালক', 'মৃত্যুর অতীত'। গণনাট্যে প্রচুর পথ নাটক করেছেন।

ইন্দ্রনীল দাস (১৯৭৪--)ঃ

বালুরঘাটে ১৯৭৪ সালে ১লা জানুয়ারী জন্ম। পিতা অভিনেতা সত্যেন্দ্র প্রসাদ দাস, মাতা মীরা দেবী। বালুরঘাট উচ্চবিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক। বালুরঘাট কলেজ থেকে স্নাতক এবং লাইব্রেরী সাইন্সে এম.লিব.। তিনি একজন স্কুল লাইব্রেরিয়ান। ৮-৯ বছর বয়সে নাট্যমন্দিরে 'কালাবদর' নাটকে মাঝির ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিনি বর্তমানে নাট্যমন্দিরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত এবং সমভাবে অভিনয় করছেন। 'প্রদোষে প্রভাত'(যুবক), 'মারিচ সংবাদ'(মারীচ), 'দায়বদ্ধ'(দেবু) প্রভৃতি তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক।

রক্তিম সাহা (১৯৭৪---)ঃ

রক্তিম সাহা বর্তমানে হয়ে ওঠা পরিচালক ও মিউজিক ডিরেক্টর অভিনয়ও করেন। বালুরঘাটের নেপালী পাড়ায় ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭৪ সালে জন্ম। পিতা রামকৃষ্ণ সাহা, মাতা লাবন্য প্রভা দেবী। নালন্দা বিদ্যাপীঠ থেকে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। বালুরঘাট কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করলেন। কর্মজীবনে তিনি ব্যবসায়ী। বালুরঘাট নাট্যকর্মীতে 'দ্যা জাষ্ট'(ভয়ানক) তাঁর প্রথম নাটক। 'আলকায়দা' নাটকটি পরিচালনা করেছেন। তূণীর নাট্য সংস্থায় করেছেন 'সন্ন্যস্ত'। বর্তমানে তিনি 'সমমন' নাট্য সংস্থায় মিউজিক ডিরেক্টরের কাজ করেন।

অমিত সাহা (১৯৭৪---)ঃ

অমিত সাহা জন্ম বালুরঘাট, ৮.৬.১৯৭৪ সাল। পিতা হিমাংশু সাহা, মাতা গায়েত্রী দেবী। প্রাথমিক পাঠ শুরু হয় বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ থেকে সেখান থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে তৃতীয় শ্রেণীতে বালুরঘাট হাইস্কুলে আসেন এবং এখান থেকেই উচ্চমাধ্যমিক ১৯৯২ সালে পাশ করেন। বিজ্ঞান বিভাগে বালুরঘাট কলেজ থেকে স্নাতক ১৯৯৪ সালে। পড়াশোনা চলাকালীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরীতে যোগ দেন।

ছোট থেকেই অভিনয় তাকে আকর্ষণ করত। ১৯৯৫ সাল থেকে পাড়ার নাট্যদল 'অঙ্কুর'এ 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণ মন্ডলের ঘর গেরস্তী' (মতিশা), 'বাজি'(পুলিশ,বৃদ্ধ), 'উপজিল বিষহরী' (বংশী), 'আলিবাবার পাঁচালী'(আবদুল্লা)। ২০০০ সালে তিনি

নাট্যকর্মীতে প্রবেশ করেন। এখানে তিনি করেন 'গোধূলী বেলায়', 'দ্য জাষ্ট'(স্টেপন), 'ঝুমুর'(মদন),'আলকায়দা'(সন্তোষ), 'ফিরে' পাওয়া'। এখন তিনি নাট্যশিল্পের সঙ্গে ওতোপ্রোত জড়িত।

সন্তু রায় (১৯৭৭---)ঃ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডীতে ৪.৯.১৯৭৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা নিমাই রায়, মাতা অঞ্জু দেবী। বাবা চাকুরী সূত্রে বালুরঘাটে থাকতেন তাই তাঁর পড়াশোনা শুরু হয় বালুরঘাটে। যদিও তাঁর পৈতৃক নিবাস রায়গঞ্জের কুমার ডাঙ্গী। মনিমালা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে বালুরঘাট হাইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং এখানে থেকেই তিনি উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন ১৯৯৫ সালে। বালুরঘাট কলেজ থেকে বাংলা বিষয়ে স্নাতক হন ১৯৯৮ সালে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০০ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। আবার তিনি 'শিক্ষা' স্নাতকের ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি একজন শিক্ষক। তাঁর মা পাড়ায় স্কুলে নাটক করতেন। জ্যাঠামশাই হরিনারায়ণ রায় রায়গঞ্জের 'ছন্দম' নাট্যগোষ্টীতে রয়েছেন। পারিবারিক সূত্রে তিনি অভিনয় প্রতিভা পেয়েছেন। তাঁর প্রথম অভিনয় ২০০২ সালে A.B.T.A. এর বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'আলোর দিশারী' (কৃপন শিক্ষক) তিনি বালুরঘাট গণনাট্যে শপথ শাখাতে করেন 'আগুনের ফুলকি', 'বদনাম', 'বালুরঘাট সৃজন' নাট্য গোষ্ঠীতে করেন 'দেনাপাওনা'(নিরুপমার দাদা), 'শপথের অধিকার'। অনুনাটক 'ভয়' ও 'বোমা'।

মহুয়া ভট্টাচার্য (১৯৭৮---)ঃ

আদি নিবাস কালিয়াগঞ্জের রাইকলোনীতে। ৯.৯.১৯৭৮ সালে রায়গঞ্জে জন্ম পিতা সুখেন্দু ভট্টাচার্য, মাতা শিলা দেবী। কালিয়াগঞ্জের প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী, মনিমালা প্রাথমিক স্কুল (কালিয়াগঞ্জ) থেকে চতুর্থ শ্রেণী পাশ করেন। মনমোহন বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং পাবর্তী সুন্দরী বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন ১৯৫৫ সালে। কালিয়াগঞ্জ কলেজ থেকে ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতক হন। ১৯৯৯ সালে তিনি হাইস্কুল শিক্ষিকা রূপে কর্মজীবন শুরু করেন, শিক্ষকতা করতে করতেই তিনি ২০০২ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। অতি শৈশব থেকেই তিনি অভিনয় করেন। সাতবছর বয়সে সুকুমার রায়ের 'পেটে ও পীঠে' পিসিমা চরিত্রে অভিনয় করেন। কালিয়াগঞ্জ 'নজমু নাট্যতীর্থে' তিনি নাটক করেছেন 'অমল ও দইওয়ালা' নাটকে অমল চরিত্রে। তখন তিনি ক্লাস সিক্স এ পড়েন। নবম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় তিনি করেন 'রক্তকরবী' নাটকে নন্দিনী চরিত্রে। 'পোষ্ট মাষ্টার'এ করেন রতন চরিত্রে। এরপর তিনি দীর্ঘদিন নাটক থেকে বিরত থাকেন কারণ এই সময় পর্বে তিনি রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। কর্মসূত্রে তিনি বালুরঘাট শহরে এসে ২০০৩ গণনাট্য বালুরঘাট শাখার সঙ্গে যুক্তহন এবং এখানে তিনি করেন'বদনাম'(সৌদামনি), 'আমি সেই মেয়ে'(নীলমনিটুডু), ২০০৪ সালে ধৃতিমান মুখার্জীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং এই সময় পর্বে তিনি সাময়িক অভিনয় থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও বর্তমানে তিনি সক্রিয় ভাবে অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত।

জগন্নাথ দত্ত (১৯৮০---)ঃ

জগন্নাথ দত্ত ১৯৮০ সালের ১০ই জানুয়ারী বালুরঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা

অভিনেতা ভূদেব কুমার দত্ত, মাতা বীথিকা দেবী। বালুরঘাট খাদিমপর উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পাঠগ্রহণ করেন। বালুরঘাট কলেজ থেকে ইতিহাসে স্নাতক এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে ব্যবসায়ী। বাবা ভূদেব দত্ত 'ত্রিতীর্থ' নাট্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। বাবার অনুপ্রেরণায় তিনি নাট্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তাঁর প্রথম অভিনয় ১৯৯১ সালে 'জুতা আবিস্কার' নাটকে মন্ত্রির ভূমিকায়। ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ত্রিতীর্থে অভিনয় করেছেন 'পত্রশুদ্ধি' (সাধুর চ্যালা), 'দেবাংশী'(বোবা ছেলে), 'মাতৃতান্ত্রিক', 'প্রপন্না', 'বোধদয়'(জগা), 'উপলব্ধি'। ২০০২ -২০০৪ সাল পর্যন্ত 'থিয়েটার বহরমপুর' নাট্যসংস্থায় করেন 'মহাভাঁড়'(কুকুর), 'দেওয়ানগাজীর কিস্‌সা'(কৃষক), 'স্কুলশিক্ষা', 'চাঁদমনসার পালা'। এরপর ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতার 'সোদপুর রক্তকবরী' নাট্যসংস্থায় মিউজিকে যুক্ত ছিলেন। ২০০৮ সাল থেকে নাট্যকর্মীতে নাটক করছেন। ২০১৫ সালে 'বালুরঘাট মাক্স' নামে নাট্যসংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন।

শ্রীতমা দেব (১৯৮৬---)ঃ

ডাক নাম ঝুমা। মা সান্তনা দেব এর সঙ্গে ঝুমার অভিনয় শুরু। বালুরঘাট প্রাচ্যভারতীতে ২৫.১১.১৯৮৬ তে জন্ম। পিতা পরিমল চন্দ্র দেব, মাতা সান্তনা দেবী। প্রাচ্য ভারতী বিদ্যাপীঠ থেকে তাঁর পড়াশোনার হাতে খড়ি। খাদিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক।

মা সান্তনা দেবী ভারত গণনাট্য সঙ্ঘের বালুরঘাট শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেখানে তিনি অভিনয় করতেন। পাঁচ ছয় বছর বয়সে শ্রীতমা দেবের প্রথম অভিনয় 'চিঠি' নাটকে। 'চিঠি' নাটকটি জীবেশ দাসের লেখা। 'চিঠি' একাঙ্ক কলকাতার রবীন্দ্র সদনে অভিনীত হয়। ময়নাবতী নৃত্যনাট্যে তিনি ময়নাবতীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। সাত-আট বছর বয়স থেকে গণনাট্য বালুরঘাট শাখায় অভিনয় করেন। মা সান্তনা দেব এর সঙ্গে অভিনয় উল্লেখ যোগ্য। গণনাট্যে করেছেন 'বিষকাজল'(গীদনা), 'পালঙ্ক' (ফতেমা), 'ছোট বকুল পুরের যাত্রী' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছেন। গণনাট্য বালুরঘাট শাখায় বহু পথ নাটক করেছিলেন।

অগ্নিবীনায় করেছেন 'অমিত্রাক্ষর' (রিংকু) তূণীর করেছেন-'পদ্মাবতী কথা' (পদ্মাবতী) দর্পণে করেছেন 'সমুদ্র সন্ধানে', 'বিয়ের ফাঁদে'। উদিয়মান শিল্পী নিয়মিত নাটক করেছেন। অভিনয় ছাড়াও তিনি সঙ্গীত জগতে রয়েছেন।

রাইনূপুর মিত্র (১৯৮৭---)ঃ

অভিনেতা পরিচালক প্রদোষ মিত্রের কন্যা রাইনূপুর মিত্রের ২৬.১২.১৯৮৭ তে কলকাতায় জন্ম। মাতা সুপর্ণা মিত্র (শিক্ষিকা আর.সি.ডি. গালর্স, বালুরঘাট) নার্সারী থেকে হায়ারসেকেন্ডারী পর্যন্ত বালুরঘাট আত্রেয়ী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। হায়ারসেকেন্ডারী পড়েছেন বিজ্ঞান বিভাগে। ইংরেজী নিয়ে বি. এ. পাশ করেন স্কটিশচার্চ কলেজ, কলকাতা থেকে। M.B.A. নিউদিল্লী SRISIIM-2010, B.ED 2011 গৌড়বঙ বিশ্ববিদ্যালয় First Class Fist বর্তমানে তিনি খামিদপুর উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। মেধাবী রাইনূপুর ছোট থেকে অভিনয়েও পটু। বালুরঘাট নাট্যকর্মীর প্রযোজনায়, প্রদোষ মিত্রের পরিচালনায় ভাস্কর চ্যাটার্জীর নাট্যরূপ

(কাহিনি প্রদোষ মিত্র) 'সানাই'এ একক অভিনয় করে দর্শক ও সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মাত্র আট বছর বয়সে একক অভিনয় করা যথেষ্ট প্রতিভা ও সাহসের প্রয়োজন। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এই প্রথম আট বছরের শিশু সার্থক ভাবে একক অভিনয় করেন। রাইনূপুর মিত্র 'সানাই' নাটকের সুবাদে 'চিলড্রেন মিউজিয়াম' পুরস্কারে ভূষিত হন ২০০০ সালে। পড়াশোনার জন্য কয়েকবছর অভিনয় বন্ধ থাকার পর আবার তিনি পূর্ণোদ্দমে নাটক করছেন।

তারাপদ রায় (?-১৯৯৩)ঃ

হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নাট্যমন্দিরে প্রবেশের (১৯৬৭) পূর্বে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে নাটক অভিনয় কালে প্রম্পটারের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তারাপদ রায় ছিলেন একজন উচ্চমানের প্রম্পটার। স্বল্পভাষী মানুষ ছিলেন। উন্নত নাশা দীর্ঘ টান টান শরীরটা ঠিক থিয়েটারের সাথে মানান সই ছিল। জেলা পরিষদে চাকরী করতেন। বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বেশ কিছু নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। কিন্তু অভিনয় করার চেয়ে তিনি ছিলেন একজন ভালো প্রম্পটার। নাট্যমন্দিরে বহু নাটকে তিনি প্রম্ট করেছিলেন। ১৯৯৩ সালের ১৮ই মার্চ তিনি পরলোক গমন করেন।

দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ঃ

প্রাক্ স্বাধীনতাপর্বে নারীভূমিকায় অভিনয় করতেন দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৯১৯ সালে নাট্য মন্দিরে প্রবেশ। নারী চরিত্রে অতুলনীয় অভিনয় করতেন। তাঁর অভিনয় দক্ষতা, সুললিত কণ্ঠ ও আনন্দদায়ক গান বহুজন প্রশংসিত ছিল। নারী চরিত্র ছাড়াও পুরুষ চরিত্রেও অভিনয় করতেন। 'সুদামা' নাটকে সুদামা চরিত্রে অভিনয় প্রশংসা লাভ করে।

নরেণ সেনঃ

প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের নরেণ সেন অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন নাট্যমন্দিরে। ছোটো খাটো চেহারার মানুষটি মঞ্চের পেছনের সমস্ত কাজ করতেন। মই বেয়ে Stage এর মাথায় পর্যন্ত উঠতেন তিনি। আবার নাটকে Heroine এর ভূমিকায়ও তিনি পালন করতেন সাফল্যের সঙ্গে। ''নরেন সেন মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতেন-বিশেষত Serio Comic Role-এ Acting score একটু loud ছিল কিন্তু খুব দাপটে অভিনয় করতেন।''[৩৬] ১৯৪০ সালে নাট্যমন্দিরে যোগদান করেন। আজীবন নাট্যমন্দিরের সদস্য ছিলেন।

অমিয় সেনঃ

১৯৪৭ সালের পর থেকেই বালুরঘাটে নতুন যুগের সূচনা ঘটে। দেশভাগের পর দিনাজপুর ড্রামাটিক ক্লাবের কিছু নাট্যানুরাগী ব্যক্তি সরকারী চাকরী নিয়ে বালুরঘাটে আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন অমিয় সেন। সুভদ্র, উদার অমিয় সেন ছিলেন অসাধারণ অভিনেতা এবং সুদক্ষ পরিচালক। 'কারাগার', কর্ণাজুন', 'চাঁদসদাগর', 'খনা', 'দেবাসুর', 'মমতাময়ী হাসপাতাল' প্রভৃতি নাটক তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় সুচারু ভাবে মঞ্চস্থ হয়েছিল। অমিয় সেনের সুযোগ্য পরিচালনায় পাঁচের দশক ও ছয়ের দশকে নাট্যমন্দিরে তখন যৌবনের দীপ্তি। অমিয় সেনই প্রথম নতুন অঙ্গিকে নাট্য পরিচালনা করে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে আধুনিকতার প্রবর্তন

করেন। ''অমিয় সেন খুবই উদার স্নিগ্ধ স্বভাবের মানুষ ছিলেন। পরিচালক হিসেবে তখন নাট্যমন্দিরে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। শুধু বাচিক নয় Compositor এবং Blocking movemment, Blank space, utilization, acting pace,space সব দিকে নজর ছিল তাঁর। এমনটা আমি নাট্য মন্দিরে আগে কখনও দেখিনি।''[৩৭]

অরূপ ভট্টাচার্যঃ

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের একজন দক্ষ পরিচালক ও অভিনেতা হলেন অরূপ ভট্টাচার্য। ১৯৫৭ সাল থেকে তিনি নাট্যমন্দিরের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু সদস্যপদ পান ১৯৬৬ সালে। সদস্যপদ পাওয়ার পূর্বেই তিনি নাট্যমন্দিরে অভিনয় করেন। ''সেটা সম্ভবত ১৯৫৮ সাল। আমরা কয়েকজন বন্ধু নাট্যমন্দিরের সামনের বিশুর চাষের দোকানে বসে আড্ডায় মশগুল। হঠাৎই কালিদাস সান্যাল মহাশয় আমাদের প্রস্তাব দেন নাটক করার। আমরা যেন হাতে চাঁদ পেলাম। নাট্যমন্দিরের মঞ্চে অভিনয় করাটা তখন আমাদের কাছে যেন স্বপ্ন। একটি বিচারকের দৃশ্যে জুড়ির ভূমিকায় সংলাপহীন অভিনয়, তাতে কি? তাই বা কম কিসে!''[৩৮] এর পর তাঁর শুরু হল অভিনয় জীবন। প্রথম তিনি ছোট ছোট ভূমিকায় অভিনয় করতেন। নাট্যমন্দিরে তিনি বহু নাটকে অভিনয় করেছেন-'নটী বিনোদিনী', 'নীলদর্পন', 'সমুদ্র সন্ধানে', 'সেমসাইড', 'তাহার নামটি রঞ্জনা', 'মারিচ সংবাদ', 'সকালের জন্য', 'ছেঁড়াতার', ফেরারী পৌজ', 'কাবুলিওয়ালা', অরুণোদয়ের পথে', 'নয়ন কবীরের পালা', 'ফেরা', 'গুলসন' প্রভৃতি। 'ছেঁড়াতার' তাঁর প্রথম পরিচালিত নাটক। 'মারিচ সংবাদ', 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর' ও পরাণ মন্ডলের 'ঘর গেরস্তী' তাঁর পরিচালিত নাটক।

পারুলরানী মৈত্রঃ

অভিনেতা প্রশান্ত মৈত্রের মা পারুলরানী মৈত্র। স্বাধীনতা লাভের পর পূর্বপাকিস্থান থেকে পারুলরানী মৈত্র ও তাঁর স্বামী প্রমোদাকান্ত মৈত্র দুটি সন্তানকে নিয়ে সহায় সম্বলহীন হয়ে ভারতে চলে আসেন। তিনি প্রথমে মঙ্গলপুরে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। এদেশে এসে তিনি লোকের বাড়িতে ধানচালের কাজ করতেন। মূলত অভাবের কারণেই তিনি অভিনয় জগতে এসেছিলেন। সে সময়ে নাট্যমন্দিরে যে মহিলা অভিনেত্রী অভিনয় করতেন তাঁদের স্বসম্মানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হত। পারুল রানী মৈত্র যে সাম্মানিক বা রিক্সা ভাড়া পেতেন তা তাঁর সংসারের কাজে লাগাতেন। সরকারী সাহায্য (জিয়ার) পেতেন সেগুলিও তিনি গ্রহণ করতেন। হরিশচন্দ্রপুরে তিনি মাদার ট্রেনিং এর সুযোগ পান এবং ট্রেনিং নেওয়ার পর তিলন বেসিক স্কুলে (দক্ষিণ দিনাজপুর) মাদার শিক্ষিকা হন। পরবর্তীতে মালঞ্চা প্রাথমিক (ধাপের স্কুলে) যোগদেন সাধারণ শিক্ষিকা হিসেবে। নাট্যমন্দিরে 'ডাউন ট্রেন', 'ভাড়াটে চাই' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছেন।

রেণুকা রায় ঃ

প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী বাংলাদেশের বরিশাল জেলার ফরিদপুরের মাদারীপুরে ঘোষ দোস্তিদার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা হেমন্ত ঘোষ দোস্তিদার, মাতা সরমা সুন্দরী দেবী। বরিশালে তিনি নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। সহিদের বালি গ্রামের অমল চন্দ্র রায় চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে অবদ্ধ হন। তিনি ছিলেন নার্সিংস্টাফ। কর্মসূত্রে তিনি

আজিজগড়, তেঘরিয়া প্রভৃতি স্থানে থেকেছেন, তারপর ১৯৫৫ সালে বালুরঘাটে আসেন এবং বসবাস শুরু করেন। পুরনো হাসপাতালের কোয়ার্টারে যেটি ছিল নাট্যমন্দিরের পাশে সেখানে তিনি থাকতেন। নাট্যমন্দিরের নিয়মিত অভিনয় তাঁকে আকৃষ্ট করত। গোবিন্দ তালুকদার, মহারাজ বোস, অবিনাশ দত্ত প্রমুখের সঙ্গে আলাপ হয় এবং তাঁদের প্রেরণায় তিনি নাট্যমন্দিরের সদস্য হন (১৯৬৯) এবং অভিনয় করতে শুরু করেন। 'দুই মহল', 'ভাড়াটে চাই', 'ফেরারী ফৌজ', 'অমৃতস্য পুত্রা:', 'বৌদির বিয়ে', 'বিন্দুর ছেলে', 'লৌহকপাট', 'গণদেবতা', 'ছেঁড়াতাঁর' প্রভৃতি নাটকে তিনি উল্লেখ যোগ্য অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

ক্ষিতীশ দত্ত ঃ

ক্ষিতীশ দত্ত এর কথা না বলা হলে নাট্যমন্দিরের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ক্ষিতীশ দত্ত নাট্যমন্দিরের কেয়ারটেকার। নাট্যমন্দিরের উত্থান পতনের সাক্ষী। ''নাট্যমন্দিরের একজন কর্মচারী হয়েও তিনি ছিলেন আমাদের অভিভাকের মত আমাদের শাসন করেছেন, নাটকের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন, নাটকে পরোক্ষ অংশ নিয়েছেন।''[৩৯] নাট্যমন্দিরের পাশে হোটেল ছিল, হোটেলের পাশে লেবু গাছ ছিল, সেই গাছের পাতা দিয়ে তিনি সকলকে চা করে খাওয়াতেন। রিক্যুইজিশনের সমস্ত জিনিস গুছিয়ে রাখতেন। এমন একটি বিশেষ কৌশলে তিনি নাটকের পোষাক সাজিয়ে রাখতেন খুব সহজেই তা পাওয়া যেত। সন্ধ্যা বেলা নাট্যমন্দিরে ধুপ দিতেন, প্রদীপ দিতেন। সংস্থার প্রতি তাঁর এতোটাই ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল।

সুজিত ভট্টাচার্যঃ

সুজিত ভট্টাচার্য একাধিক গুণের অধিকারী ছিলেন। নাটককার, নির্দেশক, অভিনেতা হিসেবে তিনি বালুরঘাট নাট্যজগতে অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবার অল্পসময়ের মধ্যে তিনি তাঁর প্রতিভাকে নিয়ে এই জগতকে ত্যাগ করেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে বালুরঘাটের একটা শুভ নাট্য সম্ভাবনা লুপ্ত হয়। সুজিত ভট্টাচার্য নবদ্বীপে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সুজিত ভট্টাচার্যের দাদা অজিতেশ ভট্টাচার্য তাঁকে বালুরঘাটে নিয়ে আসেন। এখানে এসে বালুরঘাটের ঐতিহ্য নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সুজিত ভট্টাচার্য ও কয়েকজন যুবক মিলে গড়ে তোলেন 'লোকায়ন নাট্যসংস্থা' (১৯৭২)। এখানে সুজিত ভট্টাচার্যের লেখা 'চেতনা' নাটক তাঁরই নির্দেশনায় তূণীরের প্রযোজনা মঞ্চস্থ হয় ১৯৭২ সালে। ১৯৭৩ সালে গঠিত তূণীরের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন তিনি। 'শতাব্দীর পদাবলী', 'ছুটির ফাঁদে', 'দেওয়ালে পিঠ রেখে' নাটক গুলির নির্দেশক ছিলেন। তিনি অভিনয়ও করেছেন। সুজিত ভট্টাচার্যের ছিল অসাধারণ প্রতিভা। তাঁর অবাক করা কণ্ঠস্বর, সাবলীন অভিনয় দর্শককে মুগ্ধ করেছিল।

সান্তনা দেব (----১৯৯৮)ঃ

বালুরঘাট কবিতীর্থ পাড়ায় জন্ম। পিতা ট্যাপা দত্ত, মাতা বীনাপানি দেবী। নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা। পাড়ার নাটকের মূল উদ্দোক্তা ছিলেন। 'গণনাট্য', 'দর্পণ', 'অগ্নিবীনা' প্রভৃতি সংস্থাতে অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত নাটক গুলি হল অগ্নিবীনায় 'অমিত্রাক্ষর' দর্পণে 'রামধাক্কা' ইত্যাদি। তাছাড়াও গণনাট্যের বালুরঘাট শাখাতেও নাটক করেছেন।

সান্তনা দেব ভালো গানও করতেন। তিনি ১৯শে এপ্রিল ১৯৯৮ সালে পরলোক গমন করেন।

বালুরঘাটের বিভিন্ন সংস্থায় ১৯০৯ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিশেষত যাঁরা ব্যবস্থাপনা রিক্যুইজিট সংগ্রহ, রূপসজ্জা, নেপথ্য সংগীত, মঞ্চ সজ্জায় যুক্ত ছিলেন তাঁদের পরিচয় বিস্তৃত ভাবে দেওয়া সম্ভব হল না বা সকলের পরিচয় সম্পূর্ণ রূপে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই তাঁদের কেবল নাম দেওয়া হল-স্মারক চিহ্ন হিসেবে।

বাদ্যযন্ত্র
বিভূতি ভূষণ দাস,
প্রতুল জোয়াদার,
মিহির দাশগুপ্ত (তবলা)
ভাদু চক্রবর্তী
মদন ধর
সমীর চক্রবর্তী
রতন সরকার (হারমনিয়াম)
সুকুমার ঘোষ (বংশীবাদক)
সন্টু নট্ট (তবলা বাদক)
মতিলাল মুখোপাধ্যায়
শ্রীশ চন্দ্র বসু
শরৎচন্দ্র গোস্বামী
সহদেব চৌধুরী
কামিনী মোহন দাস

নৃত্য
যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত
স্মৃতিকণা দাস

আলো
পুরুষোত্তম সোমানী
ননীগোপাল বনিক
বোধিসত্ত্ব মজুমদার
বিকাশ চৌধুরী
শীতল চক্রবর্তী
সমীর চক্রবর্তী
যোগেন্দ্র সিং
জিতেন্দ্র নাথ দত্তগুপ্ত
পরেশ সমাজদার

প্রম্পটিং
রামলাল মিত্র
রাধাচরণ ভট্টাচার্য
ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য

পরিচালক
আশুতোষ ঘোষ
নৃপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য
ফণী মুখোপাধ্যায়
বঙ্কিম দেসরকার

গান
নীলকান্ত মুখার্জী
মুকুট মজুমদার
শ্যামল দাস

মঞ্চসজ্জা
জার্মান মাহালী
তোতন দাস
চন্দন সেন
অমর দত্ত
স্বপন ঘোষ
গৌতম সরকার
জীবেশ দাস
শান্তনু দাস
মনিমোহন গুহবক্সী
বিশ্বনাথ দত্ত
বিকাশ দাস
উদয় দাস

তথ্যসূত্রঃ

১। দিনাজপুরে রঙ্গমঞ্চের এক শতাব্দী মেহরাব আলী, প্রকাশনায়-মেহরাব আলী, ক্ষেত্রীপাড়া, দিনাজপুর। সংস্করণ-২০০২, ফেব্রুয়ারী। পৃষ্ঠা-৬০।

২। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-৬৯।

৩। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-৭০,৭১।

৪। 'শতবর্ষে বালুরঘাট নাট্যমন্দির' ১৯০৯-২০০৮, স্মরণিকা, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর, পৃষ্ঠা-১১।

৫। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১৯।

৬। 'প্রত্যুষ-যাঁরা স্মরণীয়, যাঁরা বরণীয়'-১৪১৭, ইকো ফ্রেন্ডস অর্গানাইজেশন বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর, পৃষ্ঠা-৪০।

৭। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-২১২।

৮। 'শতবর্ষে বালুরঘাট নাট্যমন্দির', ১৯০৯-২০০৮, স্মরণিকা, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর, পৃষ্ঠা-১৭।

৯। 'নাট্যচিন্তা নাট্যতীর্থ', তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারী, ১৯৯৩, সম্পাদক, প্রণব চক্রবর্তী, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

১০। 'নাট্যচিন্তা নাট্যতীর্থ', চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৯৪, সম্পাদক প্রণব চক্রবর্তী, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

১১। 'শতবর্ষে বালুরঘাট নাট্যমন্দির' ১৯০৯-২০০৮, স্মরণিকা, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর, পৃষ্ঠা-১৮।

১২। পূর্ববৎ ।

১৩। 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির, নাট্যউৎসব'-২০১৬, স্মরণিকা-দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, সম্পাদক সন্তোষ সাহা, পৃষ্ঠা-৩৪।

১৪। 'নাট্যচিন্তা নাট্যতীর্থ', পঞ্চব বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৯৫, সম্পাদক প্রণব চক্রবর্তী, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

১৫। 'নাট্যচিন্তা নাট্যতীর্থ'-উৎসব সংখ্যা ডিসেম্বর ২০১২, সম্পাদক প্রণব চক্রবর্তী, বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুর। (উপেক্ষিত মঞ্চমানুষ দেবল রায়-ড. শুভ জোয়ারদার) পৃষ্ঠা-১১।

১৬। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১০।

১৭। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১২।

১৮। সাক্ষাৎকার- প্রণব চক্রবর্তী-০৫.০৯.২০১৫।

১৯। সাক্ষাৎকার- সমর সরকার-০৬.০১.২০১৮।

২০। 'শতবর্ষে বালুরঘাট নাট্যমন্দির', ১৯০৯-২০০৮, স্মরণিকা, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর, পৃষ্ঠা-৮।

২১। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-৮।

২২। সাক্ষাৎকার-রেবা বন্দ্যোপাধ্যায়-১৮.১১.২০১২।

২৩। সাক্ষাৎকার-সাধন মজুমদার-১২.০৫.২০১৬।

২৪। সাক্ষাৎকার- তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়-১০.০৭.২০১৮।

২৫।পূর্ববৎ ।
২৬।পূর্ববৎ ।
২৭। ‘নাট্যচিন্তা নাট্যতীর্থ’, উৎসব সংখ্যা২০১২, সম্পাদক প্রণব চক্রবর্তী, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর। (আমিও একটা নাট্যকের চরিত্র-জয়ন্ত বিশ্বাস)-পৃষ্ঠা-১৪
২৮। পূর্ববৎ ।
২৯।পূর্ববৎ ।
৩০। ‘স্পন্দন’, দশম সংখ্যা-১৯৮০, বালুরঘাট।
৩১। ‘অন্যদিন’, পাক্ষিক পত্রিকা, ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮১ Reg. WB/BLH/11, সম্পাদক দীপঙ্কর ব্যানার্জী।
৩২। সাক্ষাৎকার-কমল দাস-১২.০৬.২০১৪।
৩৩। ‘যুগান্তর’-১০.০৩.১৯৮৭।
৩৪। ‘আনন্দ বাজার পত্রিকা’, সাপ্তাহিক আনন্দলোক, ১১ই মার্চ ১৯৮২, (‘কালাবদর’, শেষ রজনীর কড়ি-প্রবোধ বন্ধু অধিকারী)।
৩৫। সাক্ষাৎকার-নিমাই দে-১৬.০৭.২০১৬।
৩৬। ‘শতবর্ষে বালুরঘাট নাট্যমন্দির’-১৯০৯-২০০৮, স্মরণিকা, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর, পৃষ্ঠা-১৮।
৩৭। পূর্ববৎ।
৩৮। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১৪।
৩৯। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১৫।